১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৫

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

Islami Ain O' Bichar

ইসলামী আইন ও বিচার

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রকাশনায়: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ -এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

প্রকাশ কাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর-২০০৫

যোগাযোগ : সমন্বয়কারী
এস এম আবদুল্লাহ
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
১৪, শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭২ ৮২৭২৭৬
E-mail : ilrclab@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

মুদ্রণে : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা।

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

Published by Advocate MUHAMMAD NAZRUL ISLAM, General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. Pisciculture Bhaban (3rd Floor) 14, Shymoli, Shymoli bus stand, Dhaka-1207 Bangladesh, Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US$ 3

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

আইনের শাসনের জন্য প্রয়োজন নৈতিক উন্নয়ন

আমাদের দেশের কথা উঠলেই ক্ষুধা, দারিদ্র, অভাব, অশিক্ষা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে একটা কথা আইনের শাসন। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। আইনকে মূল্য দেবার প্রবণতা। এটা কোনো বন জংগলের দেশ নয় যেখানে মানুষের চেয়ে বন্য প্রাণীর সংখ্যা বেশি। কোনো মরু সাহারা অঞ্চল নয় যেখানে মরুচারী বেদুইনের তুলনায় শহুরে মানুষ অতি অল্প। এটা এমন কোনো গহীন পার্বত্য এলাকাও নয় যেখানে সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক যুগের রেশ এখনো কাটেনি। যদিও গংগা ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত সাগরের বুক থেকে জেগে ওঠা দক্ষিণের অনেকটা এলাকা অতি প্রাচীন নয় তবুও মহেঞ্জোদারো হরপ্পার সাথে পাল্লা দিয়ে গড়ে উঠেছিলে এখানকার ময়নামতি সভ্যতা। উত্তরাঞ্চলের পৌন্ড্র ও গৌড়ীয় সভ্যতাও কম প্রাচীন নয়। উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রাচীন যুগেও এ পূর্বাঞ্চল সুসভ্য হিসাবেই পরিচিত ছিল। হাজার হাজার বছর থেকে বিভিন্ন জাতির আগমন ঘটেছে এ অঞ্চলে। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণে ও সম্মিলনে এদেশে একটি ঐতিহ্যবাহী সভ্যতা জন্ম নিয়েছিল। আর সভ্যতা কোনো বিশৃংখলা নয় বরং একটা সুশৃংখল ধারাবাহিকতার নাম। অন্তত দেড় হাজার দু হাজার বছর থেকে এ এলাকার জনগোষ্ঠীর সুশৃংখল গতিধারার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য শাসন, রাজ্য গঠন, অভিযান পরিচালনা, যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মপ্রচার, ধর্মীয় জীবন গঠন, সামাজিক রীতিনীতি পরিচালনা, সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাকার সুশৃংখল জীবনের সাথে জড়িত যাবতীয় বিষয়ই শত শত হাজার বছর থেকে এ এলাকার পরিচিতি হিসাবে ইতিহাসে উল্লেখিত হয়ে আসছে।

কাজেই আইনের সাথে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীক শাসন শৃংখলার সাথে এখানকার মানুষের পরিচয় সাম্প্রতিককালের একথা বলা যাবে না। শৃংখলার ভিত্তিতে একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং ব্যবস্থার মাধ্যমে শৃংখলা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আবার শৃংখলা ভেঙে পড়লে ব্যবস্থায়ও চিড় ধরে এবং ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে শৃংখলাও ভেঙে পড়ে। ব্যবস্থা ও শৃংখলার এই যে অংগাংগী সম্পর্ক এর সাথে এ এলাকার মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে পরিচিত। বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে এ এলাকা মুসলমানদের শাসনাধীন এবং ইসলামী আইনের আওতায় চলে আসার পর সমগ্র এলাকার জনজীবনে ইসলামী আইনের মাধ্যমে একটা স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। সুশৃংখল পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে ওঠে। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন আল্লাহে বিশ্বাস এবং নিজের সারা জীবনের সমস্ত কাজের জন্য তাঁর কাছে জবাবদিহি করার ধারণা এই এলাকার মানুষকে একটা সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন গঠনে সাহায্য করে। শত শত বছরের চর্চায় এ বিষয়টা তাদের মজ্জাগত হয়ে পড়ে। তাদের জীবন ও প্রকৃতির সাথে এ আইন খাপ খেয়ে যায়। তাই তাদের জীবনে নেমে আসে অনাবিল শান্তি-শৃংখলা-আইনানুবর্তিতা।

কিন্তু ইউরোপীয়দের আগমন এবং তাদের দুশো বছরের ঔপনিবেশিক আধিপত্য ও শাসনের ফলে খৃষ্টবাদী, ধর্মীয় ও ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী সেকিউলার শাসন ব্যবস্থা এদেশের মানুষের নৈতিক মূল্যবোধগুলো ভেঙে চুরমার করে দেয়। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে। এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসক। কিন্তু আমাদের দেশের আইন শৃংখলা ব্যবস্থার চরম অবনতি চোখে দেখার মতো। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো আছেই, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও সর্বক্ষেত্রে বিশৃংখলা চরম পর্যায়ে।

আইন মেনে চলার প্রবণতা এদেশের মানুষের গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সে প্রবণতায় চিড় ধরেছে। আগেই বলেছি ঔপনিবেশিক অসম আইন ও সেই আইনের শাসনের কথা। মানুষ আইন মেনে চলে কেন? নিজের স্বার্থে। আইন মেনে চললে নিজের স্বার্থ লাভ হয় এবং সাথে সাথে অন্যের স্বার্থও হয় রক্ষিত। আবার অন্যের স্বার্থ রক্ষিত হওয়া মানে নিজের স্বার্থ রক্ষিত হওয়া। কারণ অন্যে যদি তার স্বার্থ ঠিকমত বুঝে পায়, সে যদি তার যতটুকু পাওনা ততটুকু পায় এবং অন্যের পাওনায় হাত না দেয় তাহলে অন্যের পাওনাও সুরক্ষিত হয় এবং সে তার যতটুকু পাওনা তার সবটুকু পায়। এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে মানুষ আইনের প্রয়োজন অনুভব করে আসছে।

আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থেই আইনের আওতায় থাকতে চাই। কিন্তু একদল লোক থাকতে চায় আইনের উর্ধে। তারা আইনকে পাশ কাটিয়ে কাজ করতে চায়। আইনের বাইরে অবস্থান করে তাদের কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করতে চায়। আবার অনেক সময় আইনকে হাতে তুলে নেয়। নিজেদের ইচ্ছেমত বিশৃংখলা ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি করে। মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। এ প্রবণতার ব্যাপকতা মাত্র সাম্প্রতিক এক দুশো বছরের। একে প্রতিরোধ করা এবং এর বিপরীতে আইন মেনে চলার প্রবণতাকে শক্তিশালী করা খুব বেশি কঠিন কাজ নয়। কারণ প্রথমত এখনো আইন মেনে চলা লোকদের প্রবল সংখ্যাধিক্য। তারা আইন মেনে চলতে চায় এবং শান্তিতে জীবন যাপন করতে চায়। দ্বিতীয়ত যারা আইনের বাইরে থাকতে এবং আইনকে হাতে তুলে নিতে চায় তাদের সংখ্যা শুধু অল্পই নয় তারা সমাজে ধিকৃতও। সমাজে তাদের যে প্রভাব তা নিছক অন্যায় শক্তির ভীতি ও আতংক জনিত প্রভাবের ফল। কিন্তু এই ক্ষতিকর অবস্থাটা যে আর একটা বৃহত্তর ক্ষতির দিকে সমগ্র জাতিকে ঠেলে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে আইন শৃংখলা ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে সবার মধ্যে একটা নিষ্ক্রীয়তার ভাব জন্ম নিচ্ছে এবং এর ক্ষেত্রগুলি দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে।

পারিবারিক ক্ষেত্রে শৃংখলা ভংগ। পরিবারের যে অটুট বন্ধন আমাদের এখানে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে, যেটা এক সময় ছিল আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়, সেটায় চিড় ধরতে শুরু করেছে। বাপ মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং বয়সকালে তাদের প্রতি কর্তব্য পালন করার পবিত্র দায়িত্ববোধটা যেন একটা সেকেলে প্রথায় পরিণত হতে যাচ্ছে। ফলে এর গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনটাকে বৈষয়িক ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। এর মধ্যে একটা পবিত্রতার ভাব বিরাজ করতো। কিন্তু যৌতুকের লালসা ও তালাকের আধিক্য এর মধ্যকার পবিত্রতা এবং আল্লাহ ও রসূল স. প্রবর্তিত দায়িত্বশীলতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। এভাবে ভাইবোনের সম্পর্ক এবং মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে যার যার প্রাপ্য আদায় করার ব্যাপারে প্রতারনা, বঞ্চনা ও ঠকাবার মনোবৃত্তি প্রবল হতে যাচ্ছে।

সামাজিক ক্ষেত্রে এ শৃংখলা ভংগ আরো ব্যাপক ও বিস্তৃততর। যে নৈতিক মূল্যবোধগুলোর ভিত্তিতে প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সমাজ সদস্যদের মধ্যে মিত্রতা ও একাত্মতা গড়ে উঠেছিল

তার ব্যাপক অবক্ষয় মূলত প্রকৃত সামাজিক বন্ধন ও শৃংখলায় প্রচন্ড আঘাত হেনেছে। সামাজিক হানাহানি, বিবাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, খুনোখুনি নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোর্ট কাছারির নথিপত্রগুলো ঘাঁটলে এই সামাজিক প্রতারণা ও খুনোখুনির কাগজপত্রই বেশি চোখে পড়বে। শহুরে সমাজে তবুও আইনের কিছুটা মর্যাদা ও কর্তৃত্ব আছে কিন্তু গ্রামীণ সমাজে প্রায় জোর যার মুল্লুক তার মত অবস্থা।

আর ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি সর্বত্র প্রায় ঠকাবার, শোষণ করার, ভেজাল দিয়ে বেশি লাভ করার, কাজ না করে বা কম করে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেবার প্রবণতা এমন বিপুলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে যেন মনে হতে পারে এটাই আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং এটাই আমাদের শহুরে ও গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি। সুশীল সমাজ এবং আলোকিত মানুষের কথা শোনা যায় কিন্তু দুস্কৃতি আর অন্ধকারে সব যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো বড় বড় সড়কে মুখোশধারীদের মিছিল দেখি। এ যেন তেমনি একটা ম্যারাথন মুখোশ মিছিল।

আধুনিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করছেনা জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র ও বিভাগ নেই। কাজেই আইন শৃংখলার সার্বিক চাবিকাটি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনাধীন। তাই রাষ্ট্রের পরিচালক, প্রশাসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী সবাই আইনের অধীন হবে এটাই স্বতসিদ্ধ। তারা হবে জাতির খাদেম, সেবক ও পরিচর্যাকারী। কিন্তু বাস্তবে হয়ে উঠেছে তারা রাজা বাদশাদের মত জাতির দন্ডমুন্ডের কর্তা। কিভাবে আইনকে ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করা যায় এবং কিভাবে শৃংখলার পরতে পরতে জং লাগিয়ে আইনকে অকেজো ও শিথিল করে নিজের আখের গোছানো যায় এটাই তাদের বড় রকমের প্রচেষ্টা। এক কথায় এটাকে বলা হয় দুর্নীতি। অর্থাৎ আইন ভংগ না করলে দুর্নীতি হয় না। আজ দুর্নীতির জন্য এদেশের ও এদেশে বসবাসকারী জাতির নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ আইন ভংগ করার, আইন না মেনে চলার এবং আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলার দিক দিযে সারা দুনিয়ায় আমরা সবার আগে।

আইন ও শৃংখলা বিহীন কোনো জাতি দুনিয়ায় তার স্বাধীনতাও বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারে না। এটা তো একটা সাধারণ কথা, একশো সুশিক্ষিত সৈন্য এক লক্ষ মানুষের একটি ভীড়কে কিছুক্ষনের মধ্যেই কাবু করে ফেলতে পারে। কাজেই আমাদের সচেতন হওয়া দরকার। আমাদের দেশের, রাষ্ট্রের, সমাজের, পরিবারের এবং বিভিন্ন পেশাজীবীদের মধ্যে আইন শৃংখলার প্রতি আনুগত্য ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের একটি আইন মান্যকারী সুশৃংখল জাতিতে পরিণত হতে হবে।

প্রথমে এই বোধ আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে যে, আইন শৃংখলার প্রতি বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছি। আমরা নিজেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য আগুনের কুন্ড তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছি।

জাতিগতভাবে আমাদের মধ্যে যে ধ্বস নেমেছে তাকে রুখতে হবে। শিক্ষিত অশিক্ষিত, নারী পুরুষ, ধনী গরীব, শাসক শাসিত নির্বিশেষে এ প্রশ্নে সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে। আইন ভংগের ক্ষেত্রে একজনের আর একজনকে টপকে যাবার আগ্রহ কারোর চাইতে কারোর কম নয়। আইন আছে, আদালত আছে, বিচারক আছে, বিচার হচ্ছে, অনেক অপরাধী শাস্তিও পাচ্ছে কিন্তু এর পরও আইন সমাজে ও দেশের বিভিন্ন কর্মকান্ডে

শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে পারছে না। এর কারণ আইনের শাসন তো শক্তির শাসন। অর্থাৎ আইনের পেছনে একটা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে। তাই আমরা বাহ্যিক ভীতি ও ক্ষতির কাছে পরাজিত হয়ে আইন মেনে চলি। কিন্তু যখনই বা যেখানেই এই ভীতি ও ক্ষতির আশংকা কমে যাবে অথবা সাময়িকভাবে হলেও যবনিকার পেছনে চলে যাবে তখনই আইন মেনে চলার প্রতি আমাদের অনীহা প্রবল হয়ে উঠবে। তাই আইন মেনে চলার সাথে সাথে আমাদের মধ্যে যে মানবিক বোধ আছে সেই বোধটাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ আইনের শাসনের সাথে সাথে আমাদেরকে নৈতিক শাসনের আওতাও আসতে হবে।

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ব্যবসায়িক লেনদেন, পারস্পরিক আচার আচরণ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক মান উন্নত করতে হবে। আইন মেনে চলার জন্য প্রথমে আমাদের নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। আইনটা যদি ন্যায়ানুগ ও যুক্তি সংগত হয় তাহলে নীতিগতভাবে আমরা তাকে মেনে নেবনা কেন? আর যদি সেটা ন্যায় সংগত না হয় তাহলেও সমাজে বিশৃংখলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি না করার স্বার্থে তা মেনে চলা কল্যাণকর হবে এই শর্ত সাপেক্ষে যে তার অন্যায় ও অসংগত দিকগুলোর যথাযথ তথ্য ও যুক্তি ভিত্তিক প্রতিবাদ করে যেতে থাকবো সুযোগ মতো। তবে এই ধরনের আইন একমাত্র তখনই মেনে চলা যাবে না যখন তা আল্লাহদ্রোহিতার শামিল হয়।

কাজেই আইন অমান্য করা, আইনকে পাশ কাটিয়ে চলা এবং আইনকে ব্যর্থ করে দেবার প্রবণতাকে রুখে দেবার জন্য আমাদের নৈতিক বৃত্তিকে জাগ্রত করতে হবে। যেখানে আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোই হয়েছিল 'মানবিক নৈতিক বৃত্তিগুলিকে পূর্ণতা দান করার জন্য' সেখানে নৈতিক দিক দিয়ে এত নিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে আমরা কখনো তাঁর উম্মত হবার দাবী করতে পারি না। এটা তো মুসলমান হিসাবে আমাদের মৃত্যু। আমরা হয়তো ভাষাগত এবং দেশজভাবে বাঙালী ও বাংলাদেশী থাকতে পারি কিন্তু আইন মেনে চলার প্রবণতার মৃত্যু ঘটিয়ে আমরা মুসলমান হিসাবে বেঁচে থাকতে এবং মৃত্যুকালে মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পারি না। কাজেই আমাদের ঈমান ও ইসলামের স্বার্থেই আমাদের জীবনকে দুর্নীতিমুক্ত এবং আইন শৃংখলার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই আমাদের নৈতিক বৃত্তিকে জাগ্রত এবং উন্নত ও উন্নততর করতে হবে।

আবদুল মান্নান তালিব

ফতোয়া দানে সতর্কতা ও ইজতিহাদের বৈশিষ্ট

আল্লামা ইবনে কাইয়েম

মুফতী সাহেবগণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকেন। তাঁদের কাজের পরিমন্ডল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এ সম্পর্কে আবু দাউদ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ স. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কথা আমার বরাতে (সাথে সম্পৃক্ত করে) বলবে, অথচ তা আমি বলিনি, সে নিজের ঠিকানা দোযখে করে নিবে।' আর ইলম (জ্ঞান) ছাড়া ফতোয়া প্রদান করলে ফতোয়া প্রদানকারী গোনাহগার হবে। কেউ বিশুদ্ধ মাসআলা জানা সত্ত্বেও অশুদ্ধ মাসআলা প্রদান করলে সে খেয়ানতকারী হবে।'
মুফতীদের মত কাজী (বিচারক)দের বিষয়টিও বড়ই স্পর্শকাতর। তবে কাজী (বিচারক)দের তুলনায় মুফতীদের কার্যক্রম অপেক্ষাকৃত বেশী দায়িত্বপূর্ণ। কারণ মুফতীদের ফতোয়া সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর কাজীদের (বিচারকের) বিচার বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। উদারহণস্বরূপ বলা যায়, শরীয়তের কোন বিষয়ে মুফতীদের কাছে ফতোয়া চাওয়া হলে মুফতী সাহেব তার সমাধান জানিয়ে দেন। তবে প্রদত্ত ফতোয়া শুধুমাত্র প্রশ্নকারীর জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং গোটা মানব জাতির জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে বিচারকের কাছে কোন বিচার প্রার্থনা করা হলে তিনি যে বিচার করেন তা বাদী ও বিবাদীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে রায় প্রযোজ্য হয়, অন্যদের ওপর নয়।

অজ্ঞতা সত্ত্বেও আল্লাহর নামে ফতোয়া প্রদানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

মুফতীদের কাছে কোন বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া হলে বা কাজীর (বিচারকের) কাছে বিচার প্রার্থনা করা হলে মুফতীর বা বিচারকের আল্লাহর বিধানের (শরয়ী বিধানের) বাইরে ফতোয়া প্রদান করা বা বিচার করা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অপরাধ। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন কোন বস্তুকে অংশীদার করা যার কোন ভিত্তি নেই এবং আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।' (আল কুরআন ৭:৩৩)
মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে মানবজাতির সামনে স্পষ্টাকারে নিষিদ্ধ চারটি বিষয় তুলে ধরেছেন, শুরুতে প্রাথমিক পর্যায়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বলে "অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন, এরপরে আরেকটু কঠোরতার সাথে" অযথা বাড়াবাড়ি করা ও অন্যায় অত্যাচারকে হারাম করে দিয়েছেন, এরপরে আরো কঠোর ভাষা ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করে দিয়েছেন, আর সবশেষে সর্বোচ্চ হারাম বিষয়টাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় বলেছেন, 'আল্লাহর উপর এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না' আল্লাহর উপর এমন কিছু আরোপ করা যার ইলম তোমাদের নেই তা হারাম।'

লেখক : আল্লামা ইবনে কাইয়েম সপ্তম হিজরীর শেষার্ধে দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৫১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন ইমাম ইবনে তাইমিয়ার প্রধানতম শাগরিদ, অনেকগুলো যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণেতা। অষ্টম হিজরীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে তিনি পরিচিত।

আল্লাহ তাআলার 'যাতী' (সত্তাবাচক) বা 'সিফাতী' (গুণবাচক) নামে বা দীনের কোন বিষয়ে স্বেচ্ছারিতামূলক ভিত্তিহীন কথা আরোপ করা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপের পর্যায়ভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যে সব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তাদের মঙ্গল হবে না।' (আল-কুরআন ১৬:১১৬)

এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলীর সংরক্ষণের জন্য কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ তাআলা যা হালাল করেননি তাকে হালাল বলা আর যা হারাম করেননি তাকে হারাম ঘোষণা করা। এ জাতীয় কাজ সম্পূর্ণ হারাম।

নিজের রায়ের মূল্যায়ন ও হালাল হারাম চিহ্নিতকরণে সতকর্তা

সালাফে সালেহীনের কেউ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকে এরূপ বলা থেকে দূরে থাকবে- আল্লাহ তাআলা ঐ জিনিসকে হালাল করেছেন, অমুক জিনিস হারাম করেছেন এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ আমি ঐ জিনিস হালাল করিনি, অমুক জিনিস হারাম করিনি। হালাল হারামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম বলা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

ইজতিহাদের ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। মুজতাহিদ ইজতিহাদ করে 'এটা আল্লাহর হুকুম বা বিধান' এভাবে বলা উচিত নয়। বিশুদ্ধ এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ স. সেনাপতি হযরত বুরাইদা (রা)-কে বিদায় দেয়ার প্রাক্কালে আদেশ করেছিলেন, 'তোমরা শত্রুবাহিনীকে অবরোধ (ঘেরাও) করার পর তাদেরকে আল্লাহর বিধানের ছায়াতলে আসতে এবং আল্লাহর হুকুম মেনে নিতে আহ্বান জানাবে না। কারণ তোমাদের তো আর এ কথা জানা থাকবে না যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কী? অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা মেনে নেয়ার আহ্বান জানাবে এবং আত্মসমর্পণ করতে বলবে।'

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যায়, রসূলুল্লাহ স. সেনাপতি হযরত বুরাইদাকে আল্লাহর বিধান ও নিজেদের সিদ্ধান্তের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছেন। ফলে মুজতাহিদ তার ইজতিহাদকে আল্লাহর বিধান বলে চালিয়ে দিতে পারে না।

অন্যত্র বর্ণিত আছে, একবার হযরত উমর রা. তাঁর একান্ত সচিবকে রাষ্ট্রীয় একটি হুকুমনামা লিখতে বললেন, সচিব নিজের পক্ষ থেকে এভাবে লিখলেন- 'এটি সেই নির্দেশ যা আল্লাহ তাআলা হযরত উমর রা. এর বিবেকে ঢেলে দিয়েছেন।' ফরমানটি হযরত উমরকে রা. শোনানো হলে তিনি বললেন, তুমি ভুল লিখেছ, তুমি এই লেখাটা কেটে দিয়ে এরূপ লেখ- 'এ নির্দেশটি হযরত উমরের রা. বিবেচনায় প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ সিদ্ধান্ত যদি বিশুদ্ধ হয় তবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যদি এ সিদ্ধান্ত ভুল হয় তবে এটি উমরের পক্ষ থেকে।' হযরত উমর রা. আরো বলেছেন 'শুধুমাত্র রসূলে কারীম স. এর সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ ছিল। কারণ তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করতেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। (আল-কুরআন ৪:১০৫)। আর আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এগুলো ধারণা এবং অনুমান মাত্র।'

হযরত ইমাম মালিক র. বলেন, আমাদের সালাফে সালেহীনের কাউকে বা আম জনতার কাউকেও এরূপ করতে শুনিনি। তারা কোন জিনিস সম্পর্কে এই মর্মে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন না যে এটা হালাল বা এটা

হারাম। এমনকি আমরা যাদের অনুসরণ করি তাদের কেউও খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতেন না। এ ধরনের বাক্য ব্যবহারের দুঃসাহস তাঁরা করেননি। এসব ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত শব্দ খুবই নমনীয় এবং পরিশীলিত হতো। তাঁরা শরীয়ত বিরোধী বা শরীয়ত সম্মত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে বলতেন, আমার কাছে এটা অপসন্দনীয় বা আমি এটাকে পছন্দ করি না বা এটা আমার দৃষ্টিতে ভাল মনে হচ্ছে না বা আমি এটাকে পসন্দ করি না বা এরূপ হওয়া উচিত বা এ বিষয়টাকে আমি মাকরূহ মনে করি বা এ ব্যাপারে আমি কোন অভিমত ব্যক্ত করতে পারছি না বা আমার মতামত এরূপ নয়।

হযরত ইমাম মালিক র. বলেন, আম জনতা সাধারণত কোন বিষয়ে হুট করে হয়তো হালাল শব্দটি নতুবা হারাম শব্দটি ব্যবহার করে। অথচ তোমাদের সামনে আল্লাহ তাআলার বাণী রয়েছে। 'বল এবং লক্ষ করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে নাযিল করেছেন, তোমরা সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে হারাম আর কোনটিকে হালাল সাব্যস্ত করছো। বল, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছে?' (আল কুরআন ১০:৫৯)

একারণেই ইমামগণ যথাসম্ভব হারাম শব্দ কম ব্যবহার করতেন। শরীয়তে এর হাজারো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. ইয়ামেনে দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করার ব্যাপারে বলেন, 'আমি এটাকে মন্দ মনে করি, হারাম বলি না, অথচ বাস্তবে এ বিষয়টি তাঁর মতেও স্পষ্ট হারাম। এ থেকে বুঝা যায়, তারা হারাম শব্দ ব্যবহার থেকে কতটা বিরত থাকতেন। এছাড়া তিনি সোনা রূপার পাত্রে উযূ করা মাকরূহ বলেছেন। অথচ এটি তাঁর নিকট বৈধ নয়। এছাড়া কারো অধিকাংশ সম্পদ হারাম হলে সে সম্পদ থেকে খাওয়া, ঐ পশু ভক্ষণ করা যে পশু বৃহস্পতি বা অন্য কোন তারকার নামে জবেহ করা হয়েছে বা যে পশু গায়রুল্লাহর নামে জবেহ করা হয়েছে, এ সমস্ত পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি আমার নিকট মাকরূহ, এটি আমার নিকট অপছন্দনীয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আহমদ র. খুব জটিল বিষয়ে 'আমার নিকট পসন্দনীয় নয়' বাক্য ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাঁকে শূকরের পশম পাক না নাপাক এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি আমার নিকট অপসন্দনীয়। এখানে অপসন্দনীয় শব্দ দিয়ে হারাম বুঝিয়েছেন। এরপর তাঁকে মদকে সিরকা বানানো হলে তার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এটি আমার নিকট ভাল লাগে না। অথচ এটাও তাঁর মতে হারাম।

হযরত ইমাম মুহাম্মদ র. থেকে এরূপ সর্তকতামূলক বাক্য উচ্চারিত হয়েছে। তিনি বলেন, মাকরূহ সাধারণত হারাম হয়। কেননা আমাদের নিকট কোন মাসআলায় সুস্পষ্ট প্রমাণ না এলে বা আমরা কোন মাসআলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি না পেলে মাকরূহ বলে থাকি। সরাসরি হারাম বলি না। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সোনা রূপার পাত্রে পান করা তিনি মাকরূহ বলেছেন অথচ এটি তাঁর মতে হারাম ছিল। অনুরূপভাবে রেশমের বিছানায় শয়ন করা বা রেশমের বালিশে হেলান দেয়া মাকরূহ বলা হয়েছে অথচ এটিও হারাম। এছাড়া বাচ্চাদেরকে সোনা রূপার পাত্রে খাওয়ানো, সোনা রূপা খচিত পোশাক বা রেশমের পোশাক পরিধান করানো, দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা, মুসলমানদের পরস্পর যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করা, মক্কা মুকাররমার জমি বিক্রি করা, এসব ক্ষেত্রে তিনি 'মাকরূহ' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অথচ এগুলোকে তিনি হারাম জানতেন।

মালেকী মাযহাবে হারাম ও মুবাহ-এর মধ্যবর্তী স্তরকে মাকরূহ বলা হয়, মাকরূহকে কখনো বৈধ বলা হয় না। ইমাম মালিক র. অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাকরূহ শব্দ ব্যবহার করতেন অথচ সেটি ছিল তাঁর দৃষ্টিতেও হারাম।

ইমাম শাফিয়ী র.ও অনুরূপ নমনীয় শব্দ ব্যবহার করতেন। তিনি পাশা খেলা সম্পর্কে বলেন, এ খেলাটাকে আমি অসমর্থক মনে করি যা বাতিল সদৃশ। আমি এটাকে অপসন্দ করি। তবে এর হারাম হওয়ার প্রমাণ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। এগুলোকে তিনি মাকরূহ বলে উল্লেখ করেছেন। সরাসরি হারাম বলেন নি। হারাম বলার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

মুফতীগণ ইজতিহাদ কালে কি ধরনের বাক্য বলবেন?

সারকথা হচ্ছে, কোন মাসআলার ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি না পাওয়া গেলে তা আল্লাহর নামে চালিয়ে দেয়া হারাম। তাঁর ফতোয়া আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী না হলে মুফতী সাহেব অজ্ঞানতাবশত ফতোয়া দেয়ার অপরাধে অপরাধী হবেন। অবশ্য তিনি যদি যথাসাধ্য গবেষণা চালিয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ না পান এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তার প্রমাণ না পাওয়া গেলে তিনি বর্ণিত শাস্তির যোগ্য হবেন না। তাঁর এহেন ভুল ক্ষমা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। উপরন্তু তিনি গবেষণা কাজের প্রতিদানও পাবেন। এক্ষেত্রে মুজতাহিদ বা মুফতীদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যে তাঁরা গবেষণা চালিয়ে গবেষণালব্ধ মতামত আল্লাহর নামে চালিয়ে দিবেন না। 'এটাকে আল্লাহ তাআলা হালাল করে দিয়েছেন বা এটাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন' এরূপ বাক্য ব্যবহার করবেন না। ইমাম মালিক র. এর রীতি ছিল, তিনি যে কোন মাসআলা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হলে সকলকে জানিয়ে দেয়ার সময় বলতেন 'আমরা শুধুমাত্র ধারণা অনুপাতে সিদ্ধান্ত দেই, এটিই যে সঠিক হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই।'

ফতোয়া দানে বিলম্ব করা

হযরত ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল র. প্রায়ই ফতোয়া দানে বিলম্ব করতেন। প্রতিটি মাসআলায় তিনি সাহাবা, সালাফে সালেহীনের অভিমত খোঁজ করতেন। তাঁদের মতামত পেলে বিরোধ নিস্পত্তিতে তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারতেন। তবে সাহাবী বা সালাফদের কারো কোন অভিমত না পেলে বিরোধ নিস্পত্তি সহজে করতেন না। তাঁকে কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করলে বলে দিতেন, 'যাও অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করে নাও।' এরপর যদি তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো কার কাছে যাবো? প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন, যাও; আলেমদের নিকট থেকে জেনে নাও। তিনি নির্দিষ্ট কোন আলেমের নাম বলতেন না।

ফতোয়া দানে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, কোন বিরোধপূর্ণ মাসআলায় সালাফদের কোন অভিমত না পেলে ফতোয়া দিতে নিষেধ করতেন। এমর্মে তিনি শাগরেদদের নির্দেশও দিয়েছেন যে, কোন মাসআলায় তোমার কোন ইমাম না থাকলে সে মাসআলায় তোমরা মুখ খুলবে না।

হযরত ইমাম আবু দাউদ র. হযরত ইমাম আহমদ র. কে অসংখ্য বার (আমি জানি না) বলতে শুনেছেন। তিনি এও বলতেন, আমি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে যত সহজে ফতোয়া দিতে দেখেছি এরূপ অন্য কাউকে দেখিনি। তিনি সহজ ভাবে বলে দিতেন, 'আমি জানি না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ র. বলেন, আমার পিতা বলতেন, একবার উত্তর আফ্রিকার জনৈক ব্যক্তি হযরত ইমাম মালিক র. কে কোন এক মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি 'আমি জানি না' বলেছিলেন। সে ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, আবু আবদুল্লাহ, আপনি বলছেন যে, 'আমি জানি না'। হযরত ইমাম মালেক র. তাকে বললেন, 'হ্যাঁ আমি জানি না বলছি। যাদের কাছে তুমি ফিরে যাবে তাদেরকেও বলে দেবে যে তিনি জানেন না।'

ফতোয়া প্রদান থেকে সালাফদের বিরত থাকা

হযরত সাহাবা ও তাবেঈগণ যথাসাধ্য ফতোয়া প্রদান থেকে বিরত থাকতেন, তাঁরা দ্রুত ফতোয়া প্রদানকে খুবই অপসন্দ করতেন। তাঁদের প্রত্যেকের মনে এ চিন্তাটি বদ্ধমূল থাকত, ফতোয়া প্রদানের কাজটি যদি অপর কেউ করে দিত?

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা র. বলেন, ১২০ জন সাহাবার সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের কেউ নিজ থেকে হাদীস শ্রবণ করানো পসন্দ করতেন না। বরং তাঁদের একান্ত ইচ্ছা থাকত যদি একাজটি অপর কেউ শুনিয়ে দিত? অনুরূপ তাঁরা সহজে ফতোয়া প্রদান করতেন না। প্রত্যেকেই আশা করতেন ফতোয়াটা যদি অপর কেউ দিয়ে দিত?

হযরত ইমাম মালিক র. বর্ণনা করেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এবং আসেম বিন আমর রা. দ্বয়ের কাছে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আয়াস র. এসে বললেন, জনৈক গ্রাম্য লোক তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বললেন, এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারি না। বরং তুমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস ও আবু হুরায়রা রা. এর কাছে যাও। আমি এই মাত্র তাঁদেরকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা রা. এর কাছে দেখে এসেছি। তাঁদের থেকে মাসআলার জওয়াব শুনে আমাকেও বলে যাবে। অতএব সে তাঁদের নিকট গিয়ে ঘটনা বিস্তারিত শোনাল, ঘটনা শ্রবনান্তে হযরত ইবনে আব্বাস রা. হযরত আবু হুরায়রা রা. কে বললেন, আপনি (এর জবাব) ফতোয়া প্রদান করুন। কারণ বিষয়টি বড় জটিল।

ইমাম মালেক র. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে যে ব্যক্তি ফতোয়া দিয়ে দিবে সে পাগল সদৃশ। তিনি বলেন, আমি ইবনে মাসউদকে এরূপ বলতে শুনেছি।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ র. বলতেন, 'ফতোয়া প্রদানে সেই সব লোক তাড়াহুড়া করে যারা ইলমের দিক দিয়ে অনেক হালকা ও কম ইলমের অধিকারী। আর যে সব লোক কোন একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের ইলম অর্জন করলে খুব ইলম অর্জন করেছি বলে মনে করে তারাই খুব সহজে ফতোয়া প্রদান করে থাকে। তিনি আরো বলেন, কোন কোন মাসআলায় তো মতবিরোধ খুবই বেশী। আমার জানা মতে এমন মাসআলাও আছে যার মধ্যে আট ধরনের মত রয়েছে। যদি কেউ আমার কাছে ঐ মাসআলার ফতোয়া তলব করে তবে কি করে কোন সাহসে হুট করে আমি সেই বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করব?

অনুবাদঃ শফীকুল ইসলাম গওহরী

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব কেন?

মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী

ইসলামী শরীয়তে বিয়ের মর্যাদা

বিয়ে সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগী ও আইন কানুন পর্যালোচনা করার আগে সেগুলোর পিছনে কোন ধরনের চিন্তা ও উদ্দেশ্য কাজ করছে তা অনুধাবন করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় তাদের সঠিক মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

দীন ও দীনদারী এবং ধর্মীয় জীবন যাপনের ইসলামী ধারণার দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে আল্লাহর সঠিক ও পূর্ণাংগ আনুগত্যের পথ দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ লিপ্সাকে পাশ কাটিয়ে নয় বরং তার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। ব্রহ্মচর্য, সংসার বৈরাগ্য ও যোগী সন্যাসী হয়ে যাওয়াকে ইসলাম ইবাদত বন্দেগী, উপাসনা আরাধনা ও আল্লাহর আনুগত্যের বিকৃত রূপ বলে গণ্য করেছে। মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময় প্রতিপালক প্রভুর দেখানো পথ থেকে সরে গিয়ে মানুষ নিজের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তার মাধ্যমে সেগুলো তৈরি করেছে। আল্লাহ কখনো এ সব পছন্দ করেননি। তাঁর পক্ষ থেকে কখনো এগুলোকে স্বীকৃতিমূলক সনদপত্রও দেয়া হয়নি। এর বিপরীত পক্ষে তিনি কেবল পছন্দই করেননি বরং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং সব সময় জোরেশোরে বলেছেন, মানুষকে হতে হবে এই দুনিয়ার রচয়িতা এবং এই উদ্দেশ্যে তার ভেতরের সমগ্র শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ তাকে যেসব শক্তি ও যোগ্যতা দান করা হয়েছে তার সবগুলোই তাকে দান করা হয়েছে তার জন্মগত দায়িত্ব পালন করার জন্য। এগুলোর প্রত্যেকটি শক্তিই তা আধ্যাত্মিক, বস্তুগত, চিন্তাগত বা বৈষয়িক যাই হোক না কেন মানবতার কাংখিত ক্রমোন্নতি ও দুনিয়ার বাঞ্ছিত পূণর্গঠনের জন্য অবশ্যই একটি কার্যকর শক্তি হিসাবে বিবেচিত। তাই কোনো একটি শক্তিকেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া অথবা তাকে অকেজো করে রাখা এমনকি তাকে অর্থহীন ও বাজে মনে করাও মহান স্রষ্টার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বিরোধী এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার পথ। একে কোনো দিক দিয়েও আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জ্ঞান ও সত্যের প্রবণতা বলা যায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জ্ঞান ও সত্যের প্রবণতা হচ্ছে বাইরের ও ভিতরের এবং দেহের ও আত্মার প্রত্যেকটি শক্তিকে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্যমূলক দান মনে করতে হবে, তাকে যে কোনো ভাবেই হোক কাজে লাগাতে হবে এবং তাকে সঠিক পথে ও যথার্থ সীমারেখার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

যৌন ক্ষমতাও মানুষের একটি জন্মগত ক্ষমতা। প্রকৃতিগতভাবে তার অবস্থাও অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতার মতো। অর্থাৎ এটিও এমন একটি জিনিস যাকে মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানময় আল্লাহ একটি বিশেষ প্রয়োজনে এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। তাই একে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা, এর দাবীকে আত্মার পবিত্রতার জন্য বিপজ্জনক মনে করা এবং এর মৃত্যুকে আত্মার জীবনের অপরিহার্য শর্ত মনে করা কখনোই তাঁর অভিপ্রেত হতে পারে না। বরং এই শক্তিকে জীবিত, কার্যকর ও সক্রিয় রাখাই তাঁর কাছে পছন্দনীয়। তাই নিজেকে প্রকৃতির ধর্ম

লেখক : আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও একজন বরেণ্য ভারতীয় আলেম।

আখ্যাদানকারী ইসলাম এই যৌন ক্ষমতার দাবী পূর্ণকারী একমাত্র সঠিক পদ্ধতি বিয়েকে কেবল পছন্দই করেনি বরং বিয়ে করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছে, উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছে এবং একে এড়িয়ে চলাকে তিরস্কার ও নিন্দা করেছে। এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি কথার ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়া যথেষ্ট হবে ঃ

'বিয়ে আমার একটি সুন্নাত। কাজেই যে আমার সুন্নাত (পদ্ধতি) মেনে চলবে না সে আমার হবে না।' (ইবনে মাজাহ, বিবাহ অধ্যায়)

'........ আর আমি মেয়েদেরকে বিয়েও করি। কাজেই যে আমার (এই) পদ্ধতি থেকে পিছটান দেয় সে আমার হবে না।' (বুখারী, বিবাহ অধ্যায়)

'ইসলামে নারী সংসর্গত্যাগী ব্রহ্মচারি জীবনের কোনো অবকাশ নেই।"

'ইসলামে কোনো রাহবানিয়াত তথা সংসার বৈরাগ্য নেই।' (নাইলুল আওতার, ৬ খন্ড, বিবাহ অধ্যায়)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সমস্ত কথা থেকে একটি সত্য অভ্রান্ত ভাবে সামনে এসে যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে প্রচলিত অর্থে বিয়ে একটি একান্ত ধর্মীয় বিষয় হলেও এটি ইসলামী শরীয়ত ব্যবস্থার একটি অংশ, শরীয়তেরই একটি কার্যক্রম, রসূলের একটি সুন্নাত এবং নবীদের পদ্ধতি। এই সংগে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহর দীনে ও শরীয়তে সংসার ত্যাগ ও কৌমার্য অবলম্বন করার কোনো অবকাশ নেই। এসব পছন্দ করা এবং বিয়েকে বর্জনীয় মনে করা সত্য সঠিক পথ পরিত্যাগ করার নামান্তর। ইসলামের পথ প্রদর্শনকারী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনকারীদেরকে নিজের নয়, অন্যের দলভুক্ত করেছেন। কাজেই বিয়ে সঠিক ইসলাম ও সাচ্চা ঈমানের সাথে সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টিকারী একটি কাজ। সম্পর্কটির মর্ম উদ্ঘাটন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন 'যে ব্যক্তি দান করলো আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর জন্য বিরত রইলো, আল্লাহর জন্য ভালোবাসলো এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা করলো আর আল্লাহর জন্য বিয়েও করলো, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করলো।' (আল মুসতাদরাক হাকেম, ২ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে ঈমানের ইসলামের পূর্ণতার শর্তাবলীর অন্তরভুক্ত। এটিই পূর্ণ ও যথার্থ সত্য।

মানুষ যে জীবন যাপন করে ইসলামের দৃষ্টিতে তার জন্য সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতার অস্তিত্ব একান্তই অপরিহার্য বলেই শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়েকে কাংখিত এবং ঈমান ও ইসলামের পূর্ণতার শর্ত গণ্য করা হয়েছে। আরো সুস্পষ্ট করে বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ এবং মানুষের জীবনোপকরণের প্রেক্ষিতে তার পূর্ণতা একটি সুসভ্য ও সুসংগঠিত সমাজ ছাড়া সম্ভব নয়। যেহেতু বিয়ে সর্বসম্মতভাবে সমাজ সভ্যতার ভিত্তি প্রস্তর তাই ইসলাম তাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেবে এবং তার শরীয়ত ব্যবস্থার অপরিহার্য অংগে পরিণত করবে এটাই স্বাভাবিক।

বিয়ের দুটি দিক

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের বিষয়টিকে নির্ভেজাল বৈষয়িক অথবা নির্ভেজাল ধর্মীয় কোনোটাই বলা যাবে না। কারণ এটি বুদ্ধিমান বয়স্ক পুরুষ ও নারীর স্বতস্ফুর্ত স্বাধীন পারস্পরিক চুক্তি। এই চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান অথবা কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি বা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এ দৃষ্টিতে এটিকে একটি বৈষয়িক বিষয় বলা যায়। কিন্তু এটি একটি কাংখিত ও শরীয়ত অনুমোদিত কাজ, রসূলের স. সুন্নাত, ঈমানের পূর্ণতা ও ইসলামের অপরিহার্য শর্তের অন্তরভুক্ত- এ দৃষ্টিতে এটি একটি শরীয়ী চুক্তি। এর সাহায্যে কেবল বস্তুবাদী ও বৈষয়িক উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না বরং একই সংগে ধর্মীয় ও নৈতিক কল্যাণ লাভও

কাংখিত হয় এবং শরীয়ত অনুমোদিত বিপুল পরিমাণ অধিকার ও কর্তব্যও এর সাথে সম্পৃক্ত হয়।[১] এ অবস্থায় এটি একটি ধর্মীয় বিষয় হিসাবে প্রতিভাত। অনেকটা পাক পবিত্রতাও এর সাথে সংযুক্ত হয়। মুসলিম আলেম ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে বিয়ের এ দুটি দিকই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁরা যথার্থই একে বৈষয়িক ও ধর্মীয় উভয় ধরনের বিষয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য ফকীহগণ একে মুআমালাত ও ইবাদত উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন। কাজেই বিয়েতে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা অপরিহার্য নয় কেবলমাত্র এতটুকুন দেখেই একে একটি নির্ভেজাল দেওয়ানী চুক্তি[২] অথবা একটি নির্ভেজাল বৈষয়িক কর্ম[৩] গণ্য করা যথার্থ সত্যকে অনুধাবন না করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার কারণ সম্ভবত এটাই যে, বিয়ের ফলে যেসব অধিকার ও দায়িত্ব আরোপিত হয় সেগুলো আদায় করার বিষয়টি আখেরাতের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়নি। বরং আদালতের মাধ্যমে সব সময় সেগুলো প্রয়োগ ও আদায় করা যায়। কিন্তু মূলত স্বামী-স্ত্রীর অধিকার ও দায়িত্বের ব্যাপারটি স্রেফ এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এপর আরো আছে। আর তা হচ্ছে, এই অধিকারগুলো দুনিয়ার কোনো আদালত প্রদত্ত নয় বরং আল্লাহর শরীয়ত এগুলো নির্ধারণ করেছে এবং তিনিই এগুলো দিয়েছেন। এগুলো আদায় করার জন্য যদি দুনিয়ার আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় তাহলে তার মূলেও এই প্রকৃত সত্যটিই কাজ করছে। প্রকৃত ও বাস্তব সত্যের এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক দিকটিকে দৃষ্টির আড়ালে রাখার কোনো সুযোগ ও কারণই নেই। এরপর বিয়েকে নির্ভেজাল দেওয়ানী চুক্তি বা নির্ভেজাল বৈষয়িক কর্মকান্ড মনে করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না।

উদ্দেশ্য

ইসলাম বিয়ের নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে।

এক. মানব বংশ সংরক্ষণ ও সন্তান উৎপাদন ঃ প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের বংশধারার ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধি করা। কারণ ইতিপূর্বে যেমন ইশারা করা হয়েছে, এই দুনিয়ায় মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ যে পরিকল্পনার কথা বর্ণনা করেছেন তা ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হতে পারবে না যতক্ষণ না পৃথিবীতে মানুষের বংশধারা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। তাই বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার সাচ্চা দীন হওয়ার কারণে ইসলামের জন্য বিয়েকে একটি শরীয়ত নির্ধারিত কর্ম হিসাবে উপস্থাপন করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। পাশাপাশি মানুষের বংশধারা সংরক্ষণ ও বিস্তারকে এই বিয়ের প্রথম ও মূলগত উদ্দেশ্য গণ্য করাও একান্ত জরুরী বিবেচিত হয়েছিল। কুরআন মজীদ বিয়ের এই মৌলিক উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করেছে, 'তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। কাজেই তোমাদের শস্যক্ষেত্রে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা যেতে পারো। আর তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করো।' (আল বাকারা ঃ ২২৩)

'কাজেই এখন তোমরা তাদের (অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তা কামনা করো'। (আল বাকারা ঃ ১৮৭)

---

১. বিয়ের এসব দিক ও মর্যাদার কারণে হানাফী আলেমগণ বিয়েকে ইবাদত গণ্য করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৯ খন্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা) এ ছাড়া হাদীসে বলা হয়েছে, 'বান্দা যখন বিয়ে করে, তার দীনের অর্ধেক পূর্ণ করে নেয়'। (বায়হাকী, মিশকাত, বিয়ে অধ্যায়, ২৬৮ পৃষ্ঠা)

২. যেমন বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের উচ্চতর আদালত ও বৃটিশ প্রিভিকাউন্সিল দীর্ঘকাল এ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে এসেছে। এমন কি জাস্টিস মাহমুদের মতো বিজ্ঞ মুসলিম আইনজ্ঞও এমত পোষণ করতেন। (সূত্র ঃ 'মাজমুআ কাওয়ানীন ইসলাম' ১ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, বিচারপতি ডঃ তানযীলুর রহমান।)

৩. যেমন জাস্টিস আমীর আলী অভিমত প্রকাশ করেছেন। (জামেউল আহকাম কী ফিকহিল ইসলাম, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা, আমীর আলীর পারসোনাল ল' অফ দ্য মহামেডানস এর উর্দূ অনুবাদ।)

এ আয়াত দুটি বিয়ের প্রথম ও মূলগত উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে দেয়। স্ত্রীকে শষ্যক্ষেত্র আখ্যায়িত করে এ বিষয়টি চূড়ান্ত করে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীর সাথে নৈকট্য লাভের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান লাভ করা। কারণ শস্যক্ষেতের আসল উদ্দেশ্য হয় উৎপাদন হাসিল করা এছাড়া শস্যক্ষেত লাভ করার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই থাকে না। অনুরূপ ভাবে 'ভবিষ্যতের চিন্তা করো' এবং 'কামনা করো' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো আদেশমূলক ক্রিয়াপদ। এর মাধ্যমে সত্যের আর একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। সেটি হচ্ছে, এই শস্যক্ষেত্র থেকে পণ্য উৎপাদনই (অর্থাৎ সন্তান) হচ্ছে সেই আসল প্রয়োজন যে উদ্দেশ্যে এই শস্য ক্ষেতের ব্যবস্থা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আর আল্লাহ আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা এই উৎপন্ন দ্রব্য কামনা করো এবং সেজন্য প্রচেষ্টা চালাও।

অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন 'তোমরা বিয়ে করো এবং বংশধারা জারী রাখার জন্য সন্তান উৎপাদন করো।'

বিয়ের আসল ও মৌল উদ্দেশ্য যদিও বংশ ধারা সংরক্ষণ ও সন্তান উৎপাদন এবং একথাটি সর্বজন বিদিত ও সর্বসম্মত সত্য তবুও কুরআন হাকীম একে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করার প্রয়োজন বোধ করেছে। এ থেকে এর গুরুত্ব প্রকাশ হয়।

দুই. পবিত্রতা সংরক্ষণ ঃ বিয়ের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্রতা সংরক্ষণ। কর্মের পবিত্রতা, দৃষ্টির পবিত্রতা ও চিন্তার পবিত্রতা সংরক্ষণ। পবিত্রতা, চারিত্রিক সততা ও সতীত্বকে ইসলাম অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এর বিশালতা অনুধাবন করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকুই জানা যথেষ্ট যে, ব্যভিচারীর জন্য ইসলাম যে কঠোর, ভয়াবহ ও হৃদকম্প সৃষ্টিকারী শাস্তি নির্ধারণ করেছে ইসলামী শরীয়তের দন্ডবিধি আইনে তা একক ও নজিরবিহীন। কাজেই সে এটাকে মানবতার মৌলিক মর্যাদা এবং দীন ও ঈমানের মৌলিক চাহিদা গণ্য করছে। এর ওপর কোনো সামান্যতম আঘাত আসাও তার কাছে অসহনীয়। অন্যদিকে শতকরা ৯৯ জন লোকই বিবাহিত জীবন যাপনের মাধ্যমে নিজেদের পবিত্র ও সচ্চরিত্র রাখতে পারে, এটা একটা বাস্তব সত্য। তাই ইসলাম যথার্থ এবং অনিবার্যভাবেই এই পবিত্রতা রক্ষাকে বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য গণ্য করেছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্য থেকে যারই বিয়ে করার (আর্থিক) সামর্থ থাকে তার বিয়ে করা উচিত। কারণ এ বিয়ে দৃষ্টিকে আনত ও নিয়ন্ত্রিত এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষিত রাখার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত সূত্রে, ২৬৭ পৃষ্ঠা)।

অর্থাৎ বিয়ে হচ্ছে চরিত্র ও দৃষ্টির পবিত্রতার সফল কৌশল। বিশেষ করে যৌবনকালে। এ সময় বৈবাহিক জীবন গঠন করা উচিত। নয়ত প্রকৃতি ও স্বভাবের কাছে পরাজিত হওয়া প্রায় অবধারিত। আর যেহেতু এ ধরনের পরাজয়কে কোনো ক্রমেই মেনে নেয়া যাবে না তাই নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে বিয়ে অবশ্যই করতে হবে যাতে চারিত্রিক নির্মলতা অক্ষুন্ন থাকে।

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, 'তিন ধরনের লোকের সহায়তা করা আল্লাহর দায়িত্বের অন্তরভুক্ত। এদের তৃতীয় জন হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের চারিত্রিক নির্মলতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য বিয়ে করেছে।' (তিরমিযী, ১ম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা)

জানা গেলো পবিত্রতা ও চারিত্রিক নির্মলতা অক্ষুন্ন রাখা বিয়ের একটি মৌল উদ্দেশ্যে। আর এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যার ফলে মানুষ আল্লাহর বিশেষ কৃপাভাজন হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এ উদ্দেশ্য (পবিত্রতা সংরক্ষণ) এতটাই প্রিয় এবং এ লক্ষ অর্জনে তার এ ব্যবস্থা (বিয়ে) এতই গুরুত্বপূর্ণ যার ফলে কোনো কোনো

অবস্থায় ব্যক্তি পর্যায় থেকে অগ্রসর হয়ে সমাজকে সে বিয়ের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কুরআন হাকীমের এ আয়াতটি দেখুন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যাদের কোনো জীবন সাথি নেই এবং তোমাদের নিজেদের দাস দাসীদের যারা (বিয়ের) যোগ্য হয়ে গেছে, তাদের বিয়ে করিয়ে দাও।' (নূর ঃ ৩২)

এই আয়াতে সরাসরি সমাজের দায়িত্বশীল লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমাদের মধ্যকার যেসব লোক বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে কিন্তু কোনো কারণে নিজের বিয়ে নিজে সম্পাদন করতে পারছে না তাদের বিয়ের ব্যবস্থা তোমাদের করে দেয়া উচিত। যে উদ্দেশ্যে ও যে প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে এ আয়াত যে প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে সেখান থেকেই তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সূরার শুরু থেকে এ আয়াত পর্যন্ত এবং তারপর বহুদূর পর্যন্ত যে সমস্ত হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তা সবই একই শিরোনামে সংযুক্ত হয়েছে। এগুলোর মূল কথা একটি বিশেষ মহান অর্জন। আর সেটি হচ্ছে, যে সমস্ত পথে যৌন ভ্রষ্টাচার সমাজে অনুপ্রবেশ করতে পারে সেগুলো সব বন্ধ করে দেয়া। বিয়ের বয়সী এবং বিয়ের উপযুক্ত লোকদের অবিবাহিত থাকা যেহেতু এ ধরনেরই একটি পথ তাই এপথটিও বন্ধ করে দেয়া জরুরী ছিল। আলোচ্য আয়াতে এ উদ্দেশ্যেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, সমাজকে নৈতিক গলদমুক্ত রাখাই এ আয়াতের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক পবিত্রতা সংরক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বিয়ে ছাড়া এই পবিত্রতা অর্জন করা কঠিন বরং অসম্ভব।

তিন. ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণের পূর্ণতা ঃ বিয়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য। কোনো কোনো অবস্থায় কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন অথবা কোনো সামাজিক কল্যাণও পূর্ণ করতে হয়। মানুষের জীবন প্রতিদিন এমন সব অবস্থার মুখোমুখি হয় যার ফলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বা সামাজিক কল্যাণ একটি বিরাট সমস্যা হয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় বিয়ে করা ছাড়া এ সমস্যা সমাধানের আর কোনো পথ দেখা যায় না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কার্যক্রম এক্ষেত্রে ধর্মীয় কল্যাণের স্বার্থে বিয়ে করার সবচেয়ে চমৎকার ও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এখানে এর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট হবে, তিনি যতগুলো বিয়ে করেছিলেন তার প্রত্যেকটির পিছনে অবশ্যই কোনো না কোনো দীনী, দাওয়াতী অথবা নৈতিক কল্যাণ কার্যকর ছিল। সবগুলো বিয়ের মধ্যে সাধারণভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কল্যাণটি সক্রিয় ছিল সেটি ছিল এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নারী সমাজের মধ্যে শরীয়তের বিধান সমূহ পৌঁছাবার বিশেষ করে যে মাসায়েল ও বিধানগুলো নারীদের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল সেগুলো তাদের কাছে পৌঁছাবার মাধ্যমে পরিণত হয়েছিলেন।

সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে বিয়ে করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত নির্দেশনামায় বিধৃত হয়েছে- 'তোমরা যদি আশংকা করো ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে মেয়েদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে, দুই, তিন, অথবা চার। আর যদি আশংকা করো সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।' (আন নিসা ঃ ৩)

চার. মানসিক প্রশান্তি অর্জন ও সমন্বিত পরিবার গঠন ঃ বিয়ের চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনে প্রশান্তির একটি স্বতন্ত্র আনন্দধারা সৃষ্টির উপাদান সরবরাহ করা। অর্থাৎ এমন একটি পরিবারের বুনিয়াদ তৈরি করা যেখানে প্রেম-প্রীতি স্নেহের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে এবং আবেগ অনুভূতির সমন্বয় ও একাত্মতা গড়ে উঠবে।

কুরআন হাকীমের ভাষায়, 'তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণসত্তা থেকে এবং তারই (প্রজাতি) থেকে তার জুড়িও তৈরি করেছেন, যাতে সে তার কাছে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।'

(সূরা আরাফ ঃ ১৮৯)

আয়াতের শেষের অংশ 'যাতে সে তার কাছে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে' থেকে একথা অনুধাবন করা মোটেই সংগত হবে না যে, দাম্পত্য জীবনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র পুরুষকে মানসিক প্রশান্তি দান করা এবং নারীর মানসিক প্রশান্তির কোনো বিশেষ গুরুত্বই নেই। এমনটি মনে করা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ নারী মানসিক শান্তি লাভ করবে না অথচ পুরুষ মানসিক প্রশান্তিতে হাবুডুবু খাবে এটা কোনোদিন সম্ভব নয়। তাই কুরআনের অন্য এক জায়গায় দাম্পত্য জীবনের এই লক্ষ বর্ণনা প্রসংগে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে এই ধরনের চিন্তাকে সরাসরি অসার সাব্যস্ত করা হয়েছে ঃ "আর আল্লাহর (হিকমতের) নিশানাগুলোর একটি হচ্ছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই প্রজাতি থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছ থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করো। তাছাড়া (আরো এই যে) তিনি তোমাদের (দম্পতির) মধ্যে পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও মায়া মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন'। (রুম ঃ ২১)

'তোমাদের দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি ও মায়ামমতা সৃষ্টি করেছেন'- এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের দিলে পারস্পরিক প্রীতি ও অফুরন্ত ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যার ফলে দাম্পত্য সাহচর্যের মাধ্যমে উভয়ে একে অন্যের থেকে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। কেবলমাত্র স্বামী মানসিক প্রশান্তি লাভ করে একথা বলা হয়নি।

উপরের দুটি আয়াতেরই বর্ণনাভংগী বিশেষ করে দুটি আয়াতে উল্লেখিত 'জোড়া' ও 'দম্পতি' শব্দ দুটি থেকে যে নিখাদ সত্যটির প্রকাশ হয় তা হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি সরবরাহ করা বরং এ সম্পর্ক যথার্থই প্রেম প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া মমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে ও থাকতে হবে এটিও এর অন্তরনিহিত উদ্দেশ্য।

এই বিষয়গুলোকে বিয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য গণ্য করার সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। দাম্পত্য জীবন যদি মানসিক প্রশান্তি শূন্য হয় এবং পারস্পরিক প্রীতি ভালোবাসা মমতা যদি সেখানে অনুপস্থিত থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে হবে যে, সেটি একটি নিষ্প্রাণ ও নিষ্ফল সম্পর্ক। এ ধরনের সম্পর্ক ও আত্মীয়তা একদিকে স্বামী স্ত্রীর জন্য স্থায়ী প্রাণান্তকর ক্লেশ ও যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে সমাজের জন্যও কোনো কল্যাণের বার্তা বহন করে আনে না। কারণ এ পর্যায়ে সমাজের সঠিক উন্নয়ন ও পুনরগঠন পর্বে তাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা কোনোক্রমেই তারা পালন করতে পারে না। তাই স্বামী স্ত্রীর জন্য মানসিক প্রশান্তি অর্জন করা এবং তারপর তার স্বাভাবিক পরিণতিতে একটি সমন্বিত, একমুখী ও প্রীতি মমতায় ভরা পারিবারিক কাঠামো গড়ে তোলা বিয়ের এমন একটি মহান উদ্দেশ্য যা প্রকৃতপক্ষে কেবল অত্যাবশ্যকই নয় বরং বিয়ের অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্যও অপরিহার্য।

কারণ অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলোও যথাযথ রূপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সম্প্রীতি একাকার হয়ে যায়। এ দৃষ্টিতে বিয়ের এ উদ্দেশ্য কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং অস্বাভাবিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

বাইয়ে সালাম : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

মাওলানা মুখলেসুর রহমান হাবীব

'সালাম' আরবী শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ প্রদান করা, অর্পণ করা। একে 'বাইয়ে সালাফ'ও বলা হয়। 'সালাফ' অর্থ বিগত, পূর্ববর্তী। ইমাম সারাখসী র. বলেন, এ লেনদেনে ক্রেতা অগ্রিম মূল্য প্রদান করে বলে একে 'বাইয়ে সালাম' এবং মূল্য প্রদানের সময় গত হওয়ার পর ভবিষ্যতে পণ্য সরবরাহ করা হয় বলে একে 'বাইয়ে সালাফ' বলে অভিহিত করা হয়।

যে পদ্ধতিতে ক্রেতা পণ্যের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে তার ভিত্তিতে একে পারিভাষিক অর্থে বাইয়ে সালাম বলা হয়। আর বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ বা হস্তান্তর করে একটি নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর। এই ভবিষ্যত মেয়াদের সময়সীমা নির্ধারিত হয় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।

বাইয়ে সালামের ইতিবৃত্ত

মানুষ সামাজিক জীব। সভ্যতার শুরু থেকে অদ্যাবধি মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। জীবনের নানা অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষে তখন থেকেই মানব সমাজে পারস্পরিক লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচলন শুরু হয়। অতঃপর তার ধারাবাহিকতা ও ব্যাপকতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কালক্রমে তাতে নতুন নতুন পদ্ধতি ও রীতিনীতি উদ্ভাবিত হয়। বাইয়ে সালাম সেসব উদ্ভাবিত পদ্ধতি সমূহের অন্যতম। এ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা যে দিন তাদের প্রত্যাশিত মুনাফা এবং ভোক্তারা তাদের সুবিধা ও উপকার লাভ করার প্রয়াস পায় সে দিন থেকে তাদের মধ্যে বাইয়ে সালামের অবকাঠামো ও রূপরেখার উন্মেষ ঘটে এবং ব্যবসায়ী মহলে তা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত হয়।

প্রসংগত বলা যায়, ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন্ শতাব্দী বা সহস্রাব্দে বাইয়ে সালামের সূচনা হয় তা নির্ভুল ভাবে বলা অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। তবে বিশুদ্ধ হাদীস ও ঐতিহাসিক বর্ণণানুযায়ী তৎকালীন আরবে বিশেষত মদীনার কৃষক সমাজে বাইয়ে সালামের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তারা খেজুর ও মৌসুমী ফসলের ক্রয় বিক্রয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করত। মদীনায় ক্ষুদে ব্যবসায়ীরা তাদের স্বল্প পুঁজি অগ্রিম বিনিয়োগ করত এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে কৃষক ও বাগানের মালিক থেকে সস্তা মূল্যে পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করত। অন্যদিকে বিক্রেতারা ওই লব্ধমূল্য ফসল ও ফল উৎপাদনে ব্যয় করে উৎপাদন খরচ অনেকটা লাঘব করতে সক্ষম হত। এভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় শ্রেণী বাইয়ে সালাম পদ্ধতি অবলম্বন করে বেশ লাভবান ও উপকৃত হত।

তবে সেকালে বাইয়ে সালাম শুধু ক্ষেতের ফসল আর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে সীমিত ছিল। বর্তমানে তা ওই সীমানা পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে সকল মার্কেটিং

লেখক : মুদাররিস, গবেষক ও প্রবন্ধকার।

এরিয়ায় বিশেষত ব্যাংকিং সেক্টরে এর আকর্ষণ ও গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সংগত কারণেই আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যে বাইয়ে সালামের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করে ইসলামী শরীয়ার আলোকে তার যথার্থতার প্রশ্নে গবেষণা ও পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ইসলামী আইনে বাইয়ে সালাম

মানুষের বহুবিধ কল্যাণ ও সুবিধাদির কথা বিবেচনায় এনে ইসলামী শরীয়া বাইয়ে সালামকে বৈধতার সনদ প্রদান করেছে। যেখানে পণ্য বিদ্যমান থাকার পরও তাতে পরিমাণগত্ বা গুণগত কোন রূপ অস্পষ্টতা থাকলে সে পণ্যের বেচাকেনা নিষিদ্ধ, সেখানে বাইয়ে সালামের পণ্য সরাসরি অবিদ্যমান ও অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাকে সম্পূর্ণ হালাল ও বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে মানুষের প্রভূত কল্যাণ ও স্বার্থ নিহিত আছে বলেই। ইসলামী আইন শাস্ত্রের মৌলিক চার উৎস- কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের মধ্যে প্রথম তিনটিতে বাইয়ে সালামের বৈধতার চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথাক্রমে ওগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো। সূরা বাকারা ঃ ২৮২

হযরত ইবন আব্বাস রা. বলেন, আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি, বাইয়ে সালাম সম্পর্কে কুরআনে এক নাতিদীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। বাইয়ে সালামে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয় এবং পণ্য বিলম্বে হস্তান্তর করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করা হলো কি-না, তা কী পরিমাণ এবং মূল্য কি কোন বস্তু না মুদ্রা, মুদ্রা হলে কোন দেশীয় মুদ্রা, অনুরূপ ভাবে প্রদত্ত মূল্যের বিনিময় স্বরূপ পরবর্তী সময়ে হস্তান্তরযোগ্য যে পণ্য ধার্য হয়েছে তার পরিমাণ কত ও কোথায় প্রদান করা হবে এবং কত দিনের মেয়াদ নির্ধারিত হবে, এ জাতীয় সমস্ত কিছু কাগজে কলমে লিখে রাখার সুপরামর্শ দিয়েছে কুরআনের এই আয়াত। ফলে কোন পক্ষ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়ার দুঃসাহস করবে না। সেই সাথে চুক্তি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা দেখা দিলে বা ভুলে গেলে লিখিত চুক্তিপত্র দেখে সমাধান করা সম্ভব হবে। কুরআনের এই বাণী মেনে চলা ফরজ বা অত্যাবশ্যকীয় না হলেও নিঃসন্দেহে তা উত্তম ও কল্যাণকর। আর যে ক্ষেত্রে মিথ্যা ও ধোকার সম্ভাবনা থাকে প্রবল এবং তা নিয়ে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে বেশি সে ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তিপত্র থাকা আবশ্যক।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই ও তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করত, তা দেখে তিনি স. বললেন, যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় করবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য করে। - সহী বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আবু আউফা রা. বলেছেন, আমরা নবী স.এর যুগে, হযরত আবু বকর রা. এর যুগে ও হযরত ওমর রা. এর যুগে বাইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়) করতাম।

ইজমার আলোকে বাইয়ে সালাম

এ ব্যাপারে পূর্বের ও পরের সকল ইসলামী ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণ মতৈক্যে উপনীত হয়েছেন যে, বাইয়ে সালাম বৈধ ও হালাল। আল্লামা ইবনে কুদামা র. বলেন, 'এতে একদিকে বিক্রেতা অগ্রিম মূল্য দ্বারা নিজের পরিবার ও উৎপাদনের ব্যয়ভার বহনে সমর্থ হয়, অন্যদিকে ক্রেতা এ সুবাদে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে

পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং এ উপকারী ব্যবসা অবশ্যই হালাল বিবেচিত হবে।' হাদীস ও ফিকহ-এর সকল নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বাইয়ে সালামের বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা বা ঐক্যের কথা বিধৃত হয়েছে।

বাইয়ে সালামের পণ্য সামগ্রী

বাইয়ে সালাম একটি লেনদেন প্রক্রিয়া। তাই যে পণ্যদ্রব্য ও বস্তুসামগ্রীর ক্ষেত্রে সাধারণ ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন বৈধ হয় বাইয়ে সালামও ওগুলোর ক্ষেত্রে বৈধ হবে। তবে এক্ষেত্রে পণ্য বিলম্বে সরবরাহ করা হয় বলে তাতে বিতর্ক ও বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় শুধু সেইসব বস্তুকেই বাইয়ে সালামের পণ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেগুলোর পরিমাণ, বৈশিষ্ট, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরন নির্ধারণ করা সম্ভব। নিম্নে এ জাতীয় কিছু পণ্যের তালিকা দেয়া হল।

- ০ ওজনযোগ্য দ্রব্য। যেমন, চাল, ডাল, লবন, চিনি, রড, সিমেন্ট ইত্যাদি।
- ০ পরিমাপযোগ্য দ্রব্য। যেমন- তেল, পানি, গ্যাস, দুধ, মধু ইত্যাদি তরল ও দাহ্য পদার্থ।
- ০ গণনাযোগ্য দ্রব্য। যেমন, কলা; কমলা, ডিম, লিচু ইত্যাদি। উল্লেখ্য, গণনাযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণগতমানের উল্লেখ হওয়া জরুরী। উল্লেখিত মান ও পরিমাণে অধিক ব্যবধান থাকলে বাইয়ে সালাম বৈধ হবে না।
- ০ গজ, ফুট বা মিটার দ্বারা পরিমাপিত দ্রব্য। যেমন, কাপড়, তার, চট, কার্পেট, জমি, প্লট, ফ্ল্যাট ইত্যাদি।

উল্লেখিত পণ্যদ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় সহজেই। সুতরাং এগুলোতে বাইয়ে সালাম বৈধ হবে। স্মর্তব্য, পরিমাণ নির্ধারণের পাশাপাশি দ্রব্যাদির বৈশিষ্ট ও ধরন উল্লেখ পূর্বক তার পরিচয় ক্রেতার সামনে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে হবে। তবে স্বর্ণরৌপ্য ওজনযোগ্য দ্রব্য সামগ্রী হলেও এগুলোর দাম সর্বদা উঠানামা করে। তাই মূল্য নির্ধারণে অস্পষ্টতা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সুতরাং ওগুলোতে বাইয়ে সালাম বৈধ হবে না। স্বর্ণরৌপ্যের মত মণিমুক্তার বিধানও অনুরূপ।

কিছু দ্রব্য আছে, যেগুলোর পরিমাণ মাপা হয় না এবং পরিমাপ করা উদ্দেশ্যও হয় না। বরং বৈশিষ্ট, আকৃতি ও ধরন এবং গুণগতমান উল্লেখ করলেই তার পুরো পরিচয় ফুটে ওঠে। যেমন, গাড়ী, ফ্রিজ, এসি, ফ্যান, কম্পিউটার, মেশিন, দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, বই, কলম, জগ, বালতি, ব্যাগ, ঘড়ি ও তৈরি পোশাক ইত্যাদি। এ জাতীয় দ্রব্যাদি বাইয়ে সালামের পণ্য হিসেবে বিক্রি হতে পারে। তবে এর বৈশিষ্টাবলি ও গুণাবলি এমন ভাবে তুলে ধরতে হবে, যেন ক্রেতার সামনে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

যে সব পণ্য সরাসরি না দেখলে তার পরিমাণ, বৈশিষ্ট ও মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না শুধু বর্ণনার ভিত্তিতে ক্রয় করলে তাতে বিস্তর তফাত দেখা দেয় এবং তার জের ধরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সে সব পণ্যসমূহের বাইয়ে সালাম বৈধ নয়। যেমন, জীবজন্তু, তরমুজ, কাঠাল, গণনায় বিক্রীত বড় মাছ, শাক-শবজির আঁটি, লাকড়ির আঁটি, ও ছোট মাছের ভাগা।

ধাতব মুদ্রা বা কাগজী মুদ্রাকে পণ্য নির্ধারণ করে বাইয়ে সালাম বৈধ হবে না। কেননা, বাইয়ে সালামে মূল্য নগদ ও পণ্য বাকীতে পরিশোধ করা হয়। অথবা মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা লেনদেন করলে পণ্য ও মূল্য উভয় নগদানগদ হওয়া শর্ত। নগদ-বাকী হলে তা সূদে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে সহজ উপায় হলো ক্রয় বিক্রয়

হিসেবে না করে 'ঋণ হিসেবে আদান প্রদান করা। যা বাকীতে পরিশোধ করা বৈধ। তবে উভয়ের প্রাপ্যের পরিমাণ সমান সমান হতে হবে। কম বেশী হলে অতিরিক্ত অংশ সূদ হবে। নির্ধারিত কোন অঞ্চল বাগান বা ক্ষেতের ফল ও ফসলের ক্ষেত্রে বাইয়ে সালাম বৈধ হবে না। কেননা, হতে পারে সেই ক্ষেত, বাগান বা অঞ্চলের পণ্য আদৌ মার্কেটে নেই এবং উল্লেখিত ক্ষেত ও বাগানে কোন ফল হয়নি। তবে বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় বড় কোম্পানীর পণ্য নির্ধারণ করে বাইয়ে সালাম করলে তা বৈধ হবে। কারণ ওই পণ্য সর্বদা ও সর্বত্র পাওয়া যায়।

আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাইয়ে সালাম

প্রচলিত ইসলামী ব্যাংক সমূহ বাইয়ে সালাম পদ্ধতিতে পণ্য ক্রয় করার শর্তে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে বিক্রেতার নিকট (গ্রাহককে) অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে থাকে। অতঃপর বিক্রেতা (গ্রাহক) ভবিষ্যতে একটি নির্ধারিত সময়ে ব্যাংকের নিকট পণ্য সরবরাহ করে থাকে। সাধারণত কৃষি, শিল্প, পশুপালন, হাঁস মুরগীর খামার ইত্যাদি প্রকল্পের খাতে ব্যাংক এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। এতে কৃষক ও শিল্পপতি ব্যাংক থেকে অগ্রিম মূল্য নিয়ে তার উৎপাদন বাড়ায় এবং পণ্যের ন্যায্য মূল্য পেয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কাউকে ঋণ প্রদান করে না। বরং পণ্য ক্রয় করার জন্য অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে। পরবর্তীতে ব্যাংক তার ক্রয়কৃত পণ্য বাজারে বিক্রি করে। বিক্রয় মূল্য যদি ক্রয়মূল্য থেকে বেশী পায় তাহলেই মুনাফা অর্জিত হয়। সালাম পদ্ধতিতে ব্যাংকের এই বিনিয়োগ ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে তখনই বৈধ হবে যখন চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, প্রকৃতি, সরবরাহের তারিখ, স্থান, পরিবহন খরচ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

বাইয়ে সালামের শর্ত

১। চুক্তিপত্রে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। মূল্য নগদ অর্থে (In cash) কিংবা পণ্যের দ্বারা পরিশোধ করা যাবে। মূল্য পণ্যের দ্বারা পরিশোধ যোগ্য হলে তা পরিমাপযোগ্য, না ওজনযোগ্য, না গণনাযোগ্য তার বিবরণ এবং পরিমাণ চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধযোগ্য হলে তা কোন মুদ্রায় তার উল্লেখ থাকতে হবে।

২। চুক্তিপত্রে বিক্রিত পণ্যের গুণাগুণ, শ্রেণী, প্রজাতি, পরিমাণ, অবস্থা, ধরন, সরবরাহের তারিখ, স্থান সময় ও পরিবহন খরচ ইত্যাদি স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে, যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা না থাকে, যা পরে বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে।

৩। অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে যে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হবে তা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

৪। চুক্তি সম্পাদনের সময় হতে পণ্য হস্তান্তরের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাজারে চুক্তিবদ্ধ পণ্য সহজ লভ্য থাকতে হবে।

৫। চুক্তিপত্রে ইসলামী শরীয়ার পরিপন্থী কোন শর্তারোপ করা যাবে না।

৬। অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য পরিশোধের বিপরীতে বিক্রেতার নিকট থেকে Security হিসেবে কোন জিনিস বন্ধক (Mortgage) রাখা যাবে।

৭। বন্ধকী পণ্য সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ক্রেতার নিকট নষ্ট হলে এর দায় দায়িত্ব ক্রেতাকে বহন করতে হবে।

৮। ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তরের মেয়াদকালের মধ্যে হস্তান্তরের পূর্বে বিক্রেতার মৃত্যু হলে ক্রেতা বন্ধকী পণ্য পাবার অধিক হকদার বলে বিবেচিত হবে। তবে বন্ধকলব্ধ পণ্যের মূল্য ক্রেতা কর্তৃক পরিশোধকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী হলে ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্য বিক্রেতার উত্তরাধিকারীগণের নিকট ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৯। ক্রেতা বন্ধকী জিনিস কোনরূপ ব্যবহার করতে পারবে না।

১০। অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় চুক্তির মেয়াদোত্তীর্ণের পূর্বে ক্রেতা ও বিক্রেতার কোন পক্ষই একক ভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। তবে পারস্পরিক সম্মতিতে যে কোন পক্ষ চুক্তির আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারবে।

১১। যুক্তিসংগত কারণে কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক সম্মতিতে চুক্তির আংশিক বাতিল করা হলে বিক্রেতা ক্রেতাকে বাতিলকৃত অংশের মূল্য ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

১২। বিক্রেতা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত মালামাল সরবরাহ দিতে ব্যর্থ হলে ক্রেতাকে মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩। বাইয়ে সালাম পদ্ধতিতে কোন বস্তু অগ্রিম ক্রয় করার পর সেই বস্তু ক্রেতার হস্তগত করার পূর্বে অপরের নিকট বিক্রি করতে পারবে না।

তথ্যসূত্র

১। সূরা বাকারা -২৮২

২। তাফসীর ইবন্ কাসীর, খন্ড-১, পৃ: ২৫৩

৩। সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ঃ সালাম অধ্যায়

৪। তাকমীলাতু ফাতহুল মুলহিম খন্ড- ১ পৃঃ ৬৫২

৫। আল মুগনী ওয়াশ শারহুল কবির, খন্ড -৫ পৃঃ ৭২১

৬। আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়া খন্ড-৩ পৃঃ ১৭৮

৭। বাদায়ে'উস সানায়ে'। খন্ড-৫ পৃঃ ২০৭

৮। রদ্দুল মুহতার লিশ শামী খন্ড-৭ পৃঃ ৪৫৪

৯। আল হিদায়া। খন্ড- ৩ পৃঃ ৯১

১০। সূদ ও ইসলামী ব্যাংকিং পৃঃ ১২৪

১১। ইসলামিক নলেজ এন্ড ডায়েরী পৃঃ ২১৫

ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহের যুক্তির ভিত্তি

ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তাঁর প্রতি কুরআনের যে অহী নাযিল হতো তা তিনি সাহাবাগণের সামনে পেশ করতেন। তারপর তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে তাঁদের সামনে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরতেন। এ সব কিছুই তিনি সামনা সামনি ও প্রত্যক্ষভাবেই করতেন। এক্ষেত্রে মাঝখানে কারোর অনুবাদ, চিন্তা- গবেষণা বা কিয়াস করার প্রয়োজন ছিল না।

তাঁর ইন্তিকালের পর এই সরাসরি ও সামনা সামনি বিধান নাযিল হওয়ার সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এর আগেই দীন পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং আল্লাহর বাণী কুরআন ব্যক্তি পরম্পরায় কণ্ঠস্থ হয়ে মুসলমানদের স্মৃতিতে একই সাথে লিখিত হয়ে লিপির মাধ্যমেও সংরক্ষিত হয়েছিল।

আর রসূলের সুন্নাত- তাঁর কথা, কাজ বা অনুমোদন সম্ভাব্য সর্বাধিক নির্ভুলতা সহকারে যেভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে সাহাবাগণ একমত হয়েছেন।

এ দৃষ্টিতে কুরআনে ও সুন্নাতে শরীয়তের বিধানের পথ নির্দেশনা নির্ধারিত হয়েছে। তারপর উভয়কে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে একত্র করা হয়েছে। কঠিন বিষয়গুলোর ওপর মতবিরোধ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো সব নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ তাঁরা অকাট্য প্রমাণ এবং একটি জনসমষ্টির অংগীকার ভিত্তিক সাক্ষ ছাড়া কোনো বিষয়ে একমত হননি। কাজেই শরীয়তের মধ্যে ইজমা একটি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য দলীলে পরিণত হয়েছে।

তারপর আমরা সাহাবা ও প্রথম যুগের উলামায়ে কেরামের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসতিদলাল তথা যুক্তি উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখতে পাই যে, তাঁরা সদৃশকে সদৃশের ওপর কিয়াস করেছেন এবং সমতুল্যকে সমতুল্যের নজির হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এব্যাপারে তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমতও হয়েছেন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের জন্য এ বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে নসে যার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে এক্ষেত্রে তাঁরা সংঘটিত সমধর্মী ঘটনার ওপর তাকে কিয়াস করেছেন এবং নসের (প্রামাণ্য দলীলে) সাথে তাকে সংশ্লিষ্ট করার জন্য যেসব শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোসহ তাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন।

লেখক : ড. ইউসুফ হামেদ আল আলেম ছিলেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুরআন বিভাগের চেয়ারম্যান। মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকাভুক্ত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থ 'আল মাকাসিদুল আম্মাতু লিশ্ শারীয়াতিল ইসলামীয়াহ' থেকে এ প্রবন্ধটি গৃহীত।

তারপর তাঁরা এই সদৃশদ্বয় ও সমতুল্যদ্বয়ের মধ্যে সঠিক সমতা বিধান করেছেন। এর ফলে সর্বাধিক নির্ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, এ দুটি বিষয়ের মধ্যে আল্লাহর হুকুম একই বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর এভাবে তার ওপর তাঁদের ইজমার ভিত্তিতে কিয়াস শরীয়তের দলীলে পরিণত হয়েছে। এটি এখন শরীয়তের চতুর্থ দলীল। শ্রেষ্ঠ উলামা ও ফিক্‌হবিদগণের অধিকাংশই একে দলীল উপস্থাপন ও মাসায়েল উদ্ভাবনের একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যারা ইজমা ও কিয়াসকে অস্বীকার করেছেন কেবলমাত্র তারা ছাড়া আর কেউ এ পদ্ধতির সমালোচনা করেননি। কাজেই অধিকাংশ উলামা শরীয়তের যেসব দলীলের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেগুলো হচ্ছেঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এছাড়াও এই চারটির সাথে জড়িত আরো কয়েকটি দলীল আছে। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় উলামা ও ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেননি। তবে অনুসন্ধান ও গভীর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এগুলো উল্লেখিত চারটি দলীলের দিকেই ফিরে আসে। এগুলো হচ্ছে ঃ ১. পূর্ববর্তী শরীয়ত, ২. সাহাবীর উক্তি, ৩. মদীনাবাসীদের আমল, ৪. ইস্তিস্‌হাব, ৫. ইস্তিহ্‌সান ৬. আল মাসালিহুল মুরসালাহ্ এবং অন্যান্য। কারদাভী তাঁর 'তানকীহুল ফুসূল' কিতাবে এ ধরনের ১৯টি দলীলের নামোল্লেখ করেছেন।[১৪]

তাঁদের অনেকে চারটি দলীলকে নিয়ন্ত্রিত করে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, দলীল হচ্ছে অহী অথবা অহী ছাড়া অন্য কিছু। এই অহী হচ্ছে মাতলু বা গায়ের মাতলু। মাতলু তথা পঠিত অহী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন এবং গায়ের মাতলু বা অপঠিত অহী হচ্ছে রসূলের সুন্নাত। অন্যদিকে অহী ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাপারে যুগের প্রত্যেক মুজতাহিদের বক্তব্য হচ্ছে সেটি ইজমা অথবা কিয়াস।[১৫] ফখরুল ইসলাম বাযদভীর[১৬] মতে শরীয়তের মূল উৎস হচ্ছে তিনটি ঃ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা। আর এই তিনটি মূল উৎস থেকে উদ্ভাবিত হয়েছে কিয়াস। কাজেই তিনটি হচ্ছে স্বতন্ত্র ও মূল উৎস এবং কিয়াস হচ্ছে একদিক দিয়ে মূল এবং অন্যদিক দিয়ে শাখা। কিয়াসের ফলে হুকুমের প্রকাশ ঘটে এবং তার গুণাবলী বিশেষ থেকে ব্যাপকতার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে উল্লেখিত তিনটি মূল উৎসের মতো সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনা।[১৭]

আমাদী ও ইবনুল হাজেবের মতে শরীয়তের যথার্থ দলীল হচ্ছে পাঁচটি ঃ কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইসতিদলাল। অন্যদিকে শাতবী শরীয়তের দলীলগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন।

এর একটি নিছক অহীর ভিত্তিতে গঠিত এবং দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছে নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক রায়ের ভিত্তিতে। আর এই বিভাগটি মূল দলীলের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে করা হয়েছে। অন্যথায় উভয় বিভাগই পরস্পরের প্রয়োজন বোধ করবে। কারণ অহীর ভিত্তিতে ইসতিদলাল করার সময় তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগের প্রয়োজন হয় আবার কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক রায় শরীয়তের দৃষ্টিতে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ না তা অহীর সূত্রে গ্রথিত হয়।

প্রথম বিভাগটি হচ্ছে ঃ কুরআন ও সুন্নাহ। আর দ্বিতীয় বিভাগটি হচ্ছে ঃ কিয়াস ও ইসতিদলাল। অবশ্য দুটি বিভাগের প্রত্যেকটিই মতৈক্য বা মতানৈক্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে।

প্রথম বিভাগটির সাথে যেকোনো ভাবেই হোক না কেন সংশ্লিষ্ট হবে ইজমা, সাহাবীর মতামত ও পূর্ববর্তী শরীয়ত। কারণ এর প্রত্যেকটি এবং তার মধ্যে যে অর্থ বিধৃত হয়েছে তা অহীর নির্দেশনার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। এর মধ্যে অন্যের বুদ্ধি খাটাবার কোনো উপায় নেই। ইজমার মধ্যে এ প্রবণতাই পরিদৃশ্যমান। অহীর সাথেই তা সম্পর্কিত। অন্য দুটির সাথে নয়। মুজতাহিদ তাঁর রায় প্রত্যাহার করতে পারেন।

দ্বিতীয় বিভাগটির সাথে যুক্ত হবে ইস্তিহ্সান ও মাসালিহুল মুরসালাহ্। এগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। আবার কখনো প্রথম বিভাগের দিকে ফিরে আসে।[৯৮]

প্রথম বিভাগটি খুঁটিনাটি বিধানের পথ নির্দেশনার দিক দিয়ে দায়িত্বশীলতার প্রামাণ্য বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। যেমন তাহারাত, সালাত, যাকাত, ব্যবসা বাণিজ্য, অপরাধ দন্ডবিধি ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিধানের ক্ষেত্রে। আবার খুঁটিনাটি বিধানের প্রামাণ্যতা যেসব নিয়ম কানুনের ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর পথ নির্দেশনার দিক দিয়েও দায়িত্বশীলতার প্রামাণ্য বিধান হিসাবে স্বীকৃত। যেমন ইজমা একটি শরয়ী প্রমাণ, কিয়াস একটি শরয়ী প্রমাণ, সাহাবীর উক্তি একটি শরয়ী প্রমাণ এবং আমাদের পূর্ববর্তী শরীয়ত একটি শরয়ী প্রমাণ ইত্যাদি।[৯৯]

আর সুন্নাহ কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। কারণ রসূলের সত্যতা হচ্ছে, তিনি মু'জিযার মাধ্যমে শিক্ষা দেন। আর আমাদের মহান রসূলের জন্য কুরআন হচ্ছে সবচেয়ে বড় মু'জিযা। তারপর একথাও সত্য যে, সুন্নাহ এসেছে কুরআনকে সুস্পষ্ট করার, তার অন্তরনিহিত অর্থের ব্যাখ্যা দেবার এবং তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার জন্য। কাজেই আল্লাহর কিতাব হচ্ছে সমস্ত উৎসের উৎপত্তি স্থল।[১০০]

শরীয়তের দলীল সমূহ তার বিধানাবলীর ভিত্তি, যা থেকে নস্ বা ইস্তিমবাত তথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়। আর এগুলো সবই এমন সংকেত যা আল্লাহর হুকুম আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয়। কারণ দলীল শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ পথ প্রদর্শক ও উন্মুক্তকারী।[১০১]

একারণে হুকুম থেকে যে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পথ নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শরীয়তের দলীল উপস্থাপন করার পদ্ধতির মধ্যে যে শক্তির তারতম্য থাকে তার ভিত্তিতে শরীয়তের দলীল শক্তিশালী ও দুর্বল হয়।

শরীয়তের প্রত্যেকটি দলীল অকাট্য বা অনুমানসিদ্ধ হয়। যদি তা অকাট্য ও চূড়ান্ত হয় তাহলে তা বিবেচনা করা ও মেনে নেয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধার অবকাশ থাকে না। যেমন সালাত, নাপাকি থেকে তাহারাত লাভ, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার, সমগ্র মুসলিম উম্মাহর আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা, আদল ও ইনসাফ করা এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য বিষয়ের ওয়াজিব হওয়া।

আর যদি তা অনুমানসিদ্ধ হয়, তাহলে প্রথমত তা প্রত্যাবর্তিত হবে মূল অকাট্য দলীলের দিকে। যদি তা মূল অকাট্য দলীলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে পারে, তাহলে পুণরায় নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হবে। সাধারণ 'খবরে ওয়াহিদ'* এর ব্যাপারে একথাই ঠিক। কুরআনের বক্তব্যকে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।"[১০২]

হাদীসে এ ধরনের আরো যে বিষয়গুলো এসেছে সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। যেমন যেসব ব্যবসায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং সূদ ও অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহর এই বাণী এগুলোর প্রতি আরোপিত হয় ঃ "আর আল্লাহ ব্যবসায়কে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন।"[১০৩]

আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ "তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।"[১০৪]

---

*যে সহী হাদিসের বর্ণনা পরম্পরার কোনো এক স্তরে মাত্র একজন, দুজন বা তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'খবরে ওয়াহিদ' বা 'খবরে আহাদ' বলা হয়।

সমস্ত 'খবরে ওয়াহিদ' ও 'মুতাওয়াতির'* হাদীসও এগুলোর প্রতি আরোপিত হয়, যদি তাদের দিক নির্দেশনা অনুমান লব্ধ না হয়। এর অন্তরভুক্ত নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীও ঃ "কোনো ক্ষতি এবং কোনো অনিষ্ট করা যাবে না।"

অবশ্যই তা মূল ও চূড়ান্ত অর্থের অন্তরভুক্ত। কারণ নিয়ম কানুন শরীয়তের সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেও ছোটখাটো ক্ষতি ও অনিষ্টের বিস্তার রোধ করা হয়েছে।

যেমন জীবন, ধন সম্পদ ও বস্তুর মধ্যে তার বিস্তার এবং সাধারণভাবে জুলুম প্রতিরোধ করা। এমন প্রত্যেকটি জিনিস যা থেকে ক্ষতি ও অনিষ্ট বুঝায় তা থেকে বাঁচা নিসন্দেহে শরীয়তের সাধারণ লক্ষ।

যখন তা অকাট্য ও চূড়ান্ত অর্থের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় না তখন অবশ্যই সেখানে সুনিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হতে হবে। সেক্ষেত্রে সাধারণভাবে কোনো কথা আরোপ করা সঠিক হবে না। এটি দুই প্রকার। এর এক প্রকার অর্থ মূলের বিরোধী এবং অন্য প্রকারটি মূলের বিরোধীও নয় আবার অনুকূলও নয়।

প্রথম প্রকারটি হচ্ছে অনুমানসিদ্ধ এবং তা মূল অকাট্য অর্থের বিরোধী এবং অন্য কোনো মূল অকাট্য অর্থ তার সাক্ষও দেয় না। এটি সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত। কারণ এটি শরীয়তের মূলনীতির বিরোধী। এ ধরনের প্রত্যেকটি অর্থ অনির্ভরযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য। তবে কখনো এর উপযোগী দৃষ্টান্তও দেয়া হয়, যা অত্যন্ত বিরল। যেমন স্ত্রীকে 'যিহার'# করার কাফ্ফারা হিসাবে পরপর দু মাস রোযা রাখা ওয়াজিব তবে যার দাসমুক্তির সামর্থ নেই একমাত্র তার জন্যই রোযা রাখার প্রশ্ন আসে। [১০৬]

প্রথম দলীল ঃ আল কিতাব

উসূলবিদ ও ফকীহগণের পরিভাষায় এটি হচ্ছে কুরআন। কুরআন আল্লাহর সুস্পষ্ট বাণী, তার মূখ্য প্রমাণ ও অকাট্য যুক্তি। তার সামনে ও পেছন থেকে কোনো বাতিলের অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। কুরআনই শরীয়তের পূর্ণাংগ বিধান, দীনের মূলনীতি ও মিল্লাতের স্তম্ভ। এটিই জ্ঞানের উৎস মূল, রিসালাতের নিদর্শন এবং দৃষ্টির ও প্রমাণের আলো। কুরআনই আল্লাহর এমন একটি পদ্ধতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া নাজাতের আর কোনো পথ নেই এবং যে তার বিরোধিতা করে এমন কোনো কিছুর সাথে সে জড়িত থাকে না। কুরআনের সাহায্যে যে হুকুম দেয় সে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে এবং কুরআনের সাহায্যে যে কথা বলে সে সত্য কথা বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের বাইরে থেকে হেদায়াত লাভ করতে চায় সে সত্য-সরল পথ হারিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি তার হেদায়াতের অনুসারী হয় সে কখনো পথ হারায় না এবং দুঃখ কষ্টও পায় না আর যে ব্যক্তি তার থেকে বিমুখ হয় তার জীবন যাপন হয় সংকুচিত।

কুরআন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী ও যুক্তিবাদী। জিন ও মানব জাতিকে সে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে তার অনুরূপ আর একটি কিতাব আনার জন্য। যদি মানুষ ও জিন সমবেত হয়ে যায় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তাহলেও তারা তা করতে সক্ষম হবে না। যেমন কবি বলেন ঃ

** যে সহী হাদীসের বর্ণনা পরম্পরায় প্রত্যেক যুগে এত অধিক বর্ণনাকারীর সংখ্যা পাওয়া যায় এবং তারা এত বিভিন্ন স্থানের হয় যে তাদের পক্ষে একত্র সমবেত হয়ে একটি হাদীস তৈরি করা সম্ভব নয়, তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ইলমে ইয়াকীন তথা এমন প্রত্যয়লব্ধ জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করা যায়, যা সকল প্রকার সংশয়-সন্দেহের উর্ধে।—অনুবাদক*

 # যিহার অর্থ পিঠ। জাহেলী যুগে আরব সমাজে যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলতো, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠ যেমন" তাহলে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যেতো। এভাবে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে যিহার বলে।

'যে চেয়েছিল অপসারণ করতে
লাজ্জার গাউন, মুসাইলামার মতো সংকীর্ণ পথে
তার প্রকাশই ছিল লজ্জা,
তার শব্দগুলো দুর্বল এবং অর্থও
যেমন তার কথা ঃ আত্ তাহেনাতু তাহনান-
পেষাই করে চোয়ালে।'[১০৭]

উসূলবিদগণ কুরআনের সংগা বর্ণনা করে বলেছেন, কুরআন হচ্ছে শ্রুতির মাধ্যমে আহৃত প্রথম দলীলনামা এবং তার সমগ্রের মূল স্বরূপ। উসূলবিদগণ কুরআনের সংগায় কয়েকটি নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করেছেন। এগুলোর সাহায্যে সে সুস্পষ্ট করে নামায যা বৈধ করে এবং যা বৈধ করে না। বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কুরআন হয় সুস্পষ্ট দলীল। আর এক্ষেত্রে যে তা অস্বীকার করে সে কাফের হয়ে যাবে কি না এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন বিষয় কুরআন থেকে জানা যায়।

তাঁরা বলেছেন, কুরআনের শব্দ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর নাযিল হয়েছে। এর মতো সূরা রচনা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এর তেলাওয়াত ইবাদতের শামিল। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি পরম্পরায় এর আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে।[১০৮]

সুন্নাত, হাদীসে কুদসী ও বিরল কেরাআত কুরআন সম গণ্য হবে না। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে কুরআন দলীল হিসাবে স্বীকৃত। কুরআনের দলীল তার আয়াতের মধ্যে চূড়ান্ত মু'জিযা হিসাবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় বিরাজিত। কোনো একজন মুসলমানও কুরআনের অপ্রামাণিকতার দাবী করে না। মতবিরোধ যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে তা হচ্ছে কুরআনের শব্দ ও অর্থ থেকে দলীল গ্রহণ ও মাসায়েল উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। কুরআনের প্রামাণিকতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

কুরআন তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে। এর একটি অংশ মক্কায় এবং অন্য অংশ মদীনায় নাযিল হয়। একারণে এর সূরাগুলো মক্কী ও মাদানী দুভাগে বিভক্ত। এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে তিনটি মত পাওয়া যায়।

এক. মক্কায় যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মক্কী সূরা, হিজরতের পরে নাযিল হলেও। অন্যদিকে মদীনায় যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা। এ বক্তব্য অনুযায়ী তৃতীয় প্রকারটি এভাবে সংগায়িত হয় যে, সফরের মধ্যে যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলোকে মক্কীও বলা যাবে না এবং মাদানীও বলা যাবে না।

দুই. মক্কী সূরা হচ্ছে সেগুলো যেগুলোতে মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর যেগুলোতে মদীনাবাসীদের সম্বোধন করা হয়েছে সেগুলো মাদানী সূরা।

তিন. হিজরতের পূর্বে যেগুলো নাযিল হয়েছে সেগুলো মক্কী এবং হিজরতের পরে যেগুলো নাযিল হয়েছে মক্কায় নাযিল হলেও মাদানী সূরা।

মক্কী ও মাদানীর প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, মক্কী সূরার মধ্যে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং মাদানী সূরায় বর্ণনা বিস্তারিত। মক্কীর বৈশিষ্ট হচ্ছে, মানুষের অন্তরে ঈমানের সম্প্রসারণ এবং মাদানীর বৈশিষ্ট, জীবনযাত্রা ও মুসলমানদের পারস্পরিক এবং মুসলমানের সাথে কাফের ও যুদ্ধকারী মুশরিকদের লেনদেনের ক্ষেত্রে শরীয়তের কার্যকর বিধান প্রণয়ন। মক্কী ও মাদানীর মধ্যে পার্থক্যটা উসূলবিদ আলেমগণের দৃষ্টিতে অনেক

বড়; বিশেষ করে নাসেখ মানসুখের ক্ষেত্রে মক্কী এক ধরনের সূরা এবং মাদানী অন্য ধরনের। তারা পরস্পর বিপরীতধর্মী বা ভিন্নধর্মী এবং প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর সংযুক্ত ও সমন্বয় সাধনকারী অংশগুলোর একটি একক কাঠামো। মক্কী সূরাগুলো আসল বুনিয়াদ রচনা করেছে এবং মাদানী সূরাগুলো তার শাখা প্রশাখা হিসাবে তাকে পূর্ণাংগ রূপ দিয়েছে। কাজেই মক্কী সূরাগুলোর লক্ষ হচ্ছে মানুষের মনে বিশ্বাসের সঞ্চার ও সম্প্রসারণ এবং তার গুণাবলীকে তাদের মনের মধ্যে দৃঢ় বদ্ধমূল করে দেয়া। অন্যদিকে স্থায়ী শরীয়ত রচনা করাই হচ্ছে মাদানী সূরাগুলোর লক্ষ। দীনকে পূর্ণাংগ রূপ দান করার ক্ষেত্রে এই আকীদা বিশ্বাস ও শরীয়ত উভয়ে সমান অংশীদার।

মক্কী আয়াতগুলোর অর্থ অনুধাবনের সাথে মাদানী আয়তগুলোর অর্থ অনুধাবন সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। আর এভাবেই উভয়ের প্রত্যেকেই নির্ভরতা ও জ্ঞানের দিক দিয়ে পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে। কারণ তাদের মধ্যে যে পিছিয়ে পড়বে তার বুনিয়াদ অবশ্যই তার ওপর রাখা হয়েছে যে এগিয়ে আছে। আরোহ পদ্ধতি তাই প্রকাশ করে। কারণ পশ্চাতবর্তীটি সংক্ষিপ্তের সুস্পষ্ট বর্ণনা হবে অথবা হবে অধিকাংশ থেকে কিছুকে বিশিষ্টতা দেয়া কিংবা সাধারণকে নির্দিষ্ট করা অথবা যার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়নি তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া বা যার পূর্ণতা প্রকাশ পায়নি তাকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করা।[১১০]

কুরআনে বিধৃত আহকাম

কুরআনে বিধৃত অধিকাংশ বিধানই সংক্ষিপ্ত। যেমন সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ, বিবাহ, অংগীকার, কিসাস, অপরাধ দন্ডবিধি ইত্যাদি। সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহকারে কুরআন শরীয়তের একটি পূর্ণাংগ বিধান রচনা করেছে। জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, যাবতীয় অভাব পূরণ, জীবনকে সূচি সুন্দর ও পূর্ণতা দান করে এমন প্রত্যেকটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দলীল ঃ সুন্নাত

সুন্নাতের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ প্রশংসিত বা নিন্দিত পথ। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোনো ভালো পদ্ধতির প্রচলন করে সে তার প্রতিদান পাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সে পদ্ধতির অনুসরণ করবে তাদের প্রতিদানও সে পাবে।'[১১১]

'ফকীহদের পরিভাষায় সুন্নাতের অর্থ হচ্ছে ঃ যা ফরযের মোকাবিলায় আসে। এটা শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীদের অভিমত। অন্যদিকে হানাফীদের মতে যা ফরয ও ওয়াজিবের মোকাবিলায় আসে।[১১২]

উসূলবিদগণের পরিভাষায় নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম ও অনুমোদন হচ্ছে সুন্নাত। কথার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, শরীয়তের আহকামের ব্যাখ্যা প্রসংগে বিভিন্ন সময় তিনি যা বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'নিয়তের ভিত্তিতেই কাজের ফলাফল নির্ধারিত হয়।'[১১৩]

তিনি বলেছেন ঃ 'ওয়ারিসের পক্ষে কোনো ওসিয়্যত করা যাবে না।'[১১৪]

তাঁর কর্মের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাহাবাগণ তাঁর কার্যাবলী থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন। এ উদ্ধৃতি তাঁর ইবাদত ও জীবন যাপনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত। যেমন তাঁর নামায পড়া, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা, রোযার নিয়ম কানুন পালন করা ইত্যাদি।

তাঁর অনুমোদনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বিভিন্ন সাহাবা যেসব কাজ করেছেন এবং তিনি সে ব্যাপারে নিরব থেকেছেন, যা থেকে তাঁর রেজামন্দি বুঝা যায় অথবা সেগুলোকে

তিনি ভালো বলেছেন বা সমর্থন করেছেন। এ ধরনের কাজ আসলে তাঁর অনুমোদিত বলে ধরে নেয়া হয়। প্রথমটির ব্যাপারে বলা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর একদল সাহাবাকে বনু কুরাইযার দিকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের কেউ যেন বনু কুরাইযাতে না পৌঁছে আসরের নামায না পড়ে।' এতে কেউ কেউ ভাবলেন, এ নিষেধাজ্ঞা শাব্দিক অর্থেই দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁরা বনু কুরাইযায় পৌঁছুতে মাগরিব হয়ে যাওয়ার কারণে মাগরিবের পরে আসরের নামায পড়েন। আবার কেউ কেউ ভাবলেন, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সাহাবাগণের দ্রুত চলা, যাতে আসরের ওয়াক্ত শেষ হবার আগে বনু কুরাইযায় পৌঁছুনো যায়। ফলে তাঁরা পথে আসরের নামায পড়ে নেন। বনু কুরাইযার যুদ্ধের সময় আসরের নামাযের ব্যাপারে সাহাবাগণের এ ইজতিহাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে তিনি নিরব থাকেন, কোনোটার প্রতিবাদ করেননি। এভাবে তিনি উভয় দলের ইজতিহাদকে অনুমোদন দান করেন।[১১৫]

দ্বিতীয়টির ব্যাপারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, খালেদ ইবনে ওলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গোসাপের গোশ্ত খেয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা বলা হলো। অথচ তিনি তা খাননি। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কি গোসাপের গোশ্ত খাওয়া হারাম হে আল্লাহর রসূল? জবাব দিলেন ঃ 'না, হারাম নয়। তবে আমার এলাকায় তা পাওয়া যায় না। আমি তা অপছন্দ করি।'[১১৬]

উসূলবিদগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব কথা ও কাজ অনুমোদনের সাহায্যে শরীয়তের বিধান প্রমাণিত হয় সেগুলোর সাথে একে বেঁধে দিয়েছেন। সুন্নাতের এ অর্থটি আমাদেরও উদ্দেশ্য।

সুন্নাতের প্রামাণিক ক্ষমতা

আলেম সমাজে সর্বসম্মতভাবে সুন্নাত প্রামাণিক ক্ষমতা সম্পন্ন হিসাবে স্বীকৃত, যদিও তা 'খবরে আহাদ' হয়। আল্লাহ বলেন, 'সে কোনো মনগড়া কথা বলে না। এটা তো অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।'[১১৭] তিনি আরো বলেন, 'রসূল তোমাদের যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো।'[১১৮] তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ।'[১১৯] আল্লাহর রসূল স. তাঁর প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন এলাকায় ও দেশে এককভাবে পাঠিয়েছিলেন শরীয়তের প্রচার করার জন্য। সুন্নাতের ওপর আমল করা ওয়াজিব এর দলীল এর মধ্যে পাওয়া যায় যদিও তা 'খবরে আহাদ' হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় তাঁর অসাক্ষাতে সাহাবাগণ এর ওপর আমল করেছেন এবং তিনি তা অনুমোদন করেছেন, আর তা ছিল 'খবরে ওয়াহিদ'। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবাগণ এর ওপর আমল করার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছেন তবে এ ব্যাপারে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাঁদের প্রতিবাদগুলোও প্রমাণিত হয়েছে। তাঁদের এই ঐকমত্য এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যাতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। সহী হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কুরআন যে সব বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছে সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়।[১২০]

ইবনে কাইয়েম বলেন, মু'মিনরা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো পথে অগ্রসর হবে না, এটাকে যখন আল্লাহ ঈমানের অপরিহার্য শর্তের অন্তরভুক্ত করেছেন তখন তাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, তারা তার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা বা তাত্ত্বিক মতবাদের অনুসরণ করবে না। এটাই হবে তাদের জন্য অপরিহার্য শর্ত। তিনি যে হুকুম দিয়েছেন তার অন্তস্থিত অর্থ ও ইংগিত থেকে যে হুকুম বুঝা যায় সেটিই তাঁর হুকুম।[১২১] হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ইন্তিকালের পরে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল গ্রহণ করার ধারা এগিয়ে চলে। নবী বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি দুটো জিনিস

রেখে যাচ্ছি ঃ আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। যতদিন তোমরা এ দুটি থেকে দলীল গ্রহণ করবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।'[১২২]

সুন্নাতের উদ্ধৃতি যখন প্রমাণিত হবে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত তার সনদ তথা বর্ণনা পরম্পরা সঠিক ও নির্ভুল বিবেচিত হবে। তখন তাঁর প্রমাণসিদ্ধতার ব্যাপারে দ্বিমতের কোনো অবকাশ থাকে না। এটিই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। কারণ নবীকে গুনাহ থেকে সংরক্ষিত রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই তাকে কোনো মনগড়া কথা বলা থেকে বিরত রাখে। শরীয়তের নির্ভরযোগ্য আলেমদের মধ্য থেকে যারা এর বিরোধিতা করেন তারা মূলত হাদীসের সনদ বা তার মতনের* অর্থ ও ইশারা-ইংগিত সম্পর্কেই কথা বলে থাকেন। কিন্তু সনদ যখনই সহী প্রমাণিত হয় তখন রসূলের কথা, কর্ম ও অনুমোদনের প্রমাণসিদ্ধতার ব্যাপারে আপত্তি উঠাবার কোনোই অবকাশ থাকে না। কাজেই সুন্নাত এমন একটি বিষয় সমষ্টি যা শরীয়তের দলীল এবং তার মধ্যে যা বিধৃত হয়েছে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব।

শরীয়তের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের মর্যাদা

শরীয়তের আইন রচনার ক্ষেত্রে কুরআনের পরে সুন্নাত দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। সুন্নাতকে কুরআনের পরে স্থান দেয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, কুরআন হচ্ছে চূড়ান্ত এবং তা থেকে ইলমে ইয়াকীন ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ হয়। অন্যদিকে সুন্নাত চূড়ান্তের কাছাকাছি এবং তা থেকে "ইলমে যন্"# লাভ করা হয়। তা থেকে যে চূড়ান্ত ও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা হয়, তা হয় সামগ্রিক ভাবে, বিস্তারিত পর্যায়ে নয়।

অন্যদিকে কুরআন থেকে চূড়ান্ত ও দৃঢ়বিশ্বাস লাভ করা হয় সামগ্রিকভাবে এবং বিস্তারিত পর্যায়ে বর্ণনার প্রেক্ষিতেও। আর চূড়ান্ত ও দৃঢ়বিশ্বাস ইলমে যন্ এর ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। ফলে কুরআন অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। আবার সুন্নাত হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা অথবা তার ওপর অতিরিক্ত ব্যবস্থা। যদি তা ব্যাখ্যা হয়, তাহলে তা হয় দ্বিতীয় সুস্পষ্টকারী।

এক্ষেত্রে সুস্পষ্টকারী রহিত হয়ে গেলে ব্যাখ্যাও রহিত হয়ে যায় কিন্তু ব্যাখ্যা রহিত হলে সুস্পষ্টকারী রহিত হয়ে যায় না। এ অবস্থায় কুরআন নিসন্দেহে অগ্রবর্তী হবে। আর যদি হাদীস ব্যাখ্যা না হয় তাহলে তা গৃহীত হবে না যে পর্যন্ত না কুরআনে তার অনুবৃত্তি হয়। এটিই কুরআনের অগ্রবর্তী হবার দলীল।[১২৩]

মু'আয রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকে একথারই ইংগিত পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেন (ইয়ামনের শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠাবার প্রারম্ভে) ঃ "জনগণের ব্যাপারে ফায়সালা তুমি কিভাবে করবে? জবাব দেন, 'আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে'। জিজ্ঞেস করেন, যদি সেখানে কোনো ফায়সালা না পাও? জবাব দেন, তাহলে আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের মাধ্যমে করবো। জিজ্ঞেস করেন, যদি সেখানেও কোনো ফায়সালা না পাও? জবাব দেন, তাহলে আমার নিজের রায়ের মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো।" এ হাদীসে সুন্নাতকে কুরআনের পরে স্থান দেয়া হয়েছে। এটি শ্রুত দ্বিতীয় দলীল।[১২৪]

কুরআনের সাথে সুন্নাতের সম্পর্ক

আল্লাহ্ তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কিতাব নাযিল করেন মুত্তাকীদের হেদায়াতের এবং মুমিনদের হৃদয়ের রোগ নিরাময়ের জন্য। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য।

*সনদ বর্ণনার পর যে মূল হাদীসটি বর্ণনা করা হয় সেটি হচ্ছে "মতন।"--- অনুবাদক।

#শোনার পরপরই দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মালেও বিশ্বাসের পাল্লা ভারী হলে তাকে হাদীসের পরিভাষায় "ইলমে যন্" বলা হয়।-অনুবাদক

এগুলোকে সামনে রেখে তিনি রসূলদের প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ঃ আইন প্রণয়ন, আচরণবিধি রচনা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি, ঘটনাবলী ও তাওহীদ- আকীদা-বিশ্বাস। কুরআন সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পর্যায়ে চূড়ান্ত নির্ভুল। তার কোনো একটি বাক্য, শব্দ বা হরফের ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে সে আর মুসলমান থাকে না।

আল্লাহর দীনের ব্যাপারে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং যে ব্যাপারে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কি বিধান আইন কানুন ও নিয়ম শৃংখলা বিধি প্রণয়ন করেছেন তা তাঁর কিতাব থেকেই জানতে হবে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, কুরআনী বিধানের বৃহদংশ সংক্ষিপ্তাকারে রয়েছে। রসূলের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া এই সংক্ষিপ্ত বিধানের মধ্যে আল্লাহর উদ্দেশ্য জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই রসূলের প্রতি আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের ওপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা তিনি সমগ্র মানব জাতির কাছে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরবেন।

গুটিকয় বিভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র মুসলিম মিল্লাত এ ব্যাপারে একমত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কর্ম ও অনুমোদনজনিত সুন্নাত ইসলামী শরীয়তের অন্যতম উৎস। শরীয়তের প্রত্যেকটি হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানার জন্য সুন্নাতের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ কুরআনে সংক্ষেপে যে হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে সুন্নাত তার ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনা অথবা তাতে অনির্দিষ্ট করে বর্ণিত হুকুমকে সুন্নাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কিংবা সাধারণ হুকুমকে বিশিষ্ট করে দিয়েছে। ফলে সুন্নাতে বর্ণিত বিস্তারিত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা অথবা বিশিষ্টতা কুরআনে বিধৃত হুকুমের সুস্পষ্ট বর্ণনায় পরিণত হয়েছে। আর সুস্পষ্ট বর্ণনা তাবলীগ ও প্রচারের অপরিহার্য অংশ। কাজেই রসূল হচ্ছেন কুরআনের মুবাল্লিগ এবং তাতে যা বর্ণিত হয়েছে তাকে সুস্পষ্টকারী। আল্লাহ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে এ সুস্পষ্ট বর্ণনার অধিকার রসূলকে দান করেছেনঃ 'এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।' [১২৪]

কুরআন রদ করেনি এমন হুকুমকে সুন্নাত কখনো প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে কুরআনে তার সপক্ষে কোনো নস্ না থাকা সত্ত্বেও সুন্নাতের মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়। যেমন স্ত্রীর সাথে তার খালা বা ফুফুকে বিয়ে করা, নখরধারী পশু ও পাখির গোশ্‌ত খাওয়া, পুরুষের রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণ ব্যবহার করা ইত্যাদি। এধরনের বিষয়গুলো কুরআনের বিধানকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোর মধ্যে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মতের অনুসারী হয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁদের মতে এ ধরনের বিষয় যখনই সুন্নাতে উল্লেখিত হয়েছে তা একটি অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অথবা কুল্লী তথা সর্বজনীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কুরআনের সামনে পেশ করা হয়েছে। অন্যদের মতে আইন প্রণয়নে সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রহণযোগ্য। এর দৃষ্টান্ত উপরে উল্লেখিত হয়েছে। অবশ্য এ দু' দলের এ মতবিরোধ নিছক শাব্দিক। কারণ যারা সুন্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিরোধী তারা কুল্লি আহকামের সীমানার মধ্যে যা কিছু প্রবেশ করে তাকে শামিল করে নেয় এবং এটি দায়িত্বেরই একটি শ্রেণী। অন্যদিকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানকারীরা এই দায়িত্বের সপক্ষে কোনো প্রেরণাদাতা দেখে না।[১২৫]

সুন্নাতের সাহায্যে কুরআনের বিধান 'মানসূখ' হওয়া এবং কুরআনের সাহায্যে সুন্নাতের বিধান 'মানসূখ' হওয়ার ব্যাপারে উসূলবিদগণের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।[১২৬]

তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ ঃ সুন্নাত হচ্ছে দলীল ও হুজ্জাত। আল্লাহর বিধান জানার ব্যাপারে কুরআনের পরে এটি হচ্ছে দ্বিতীয় উপায়। সুন্নাহ ও কুরআন উভয়ই একই লক্ষ্যাভিমুখে উৎসারিত। তাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। মূলত উভয়ের উৎসও এক। কারণ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত অহী, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।[১২৭] উৎস যখন এক উদ্দেশ্যও যখন এক তখন সেখানে তাদের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকতে পারে না। বরং সেখানে পাওয়া যাবে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা এবং শরীয়তের বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে একাত্মতা। কাজেই সুন্নাত কুরআনকে শক্তিশালী, সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ করে। (আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

গ্রন্থপঞ্জি

৯৩. ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা, ৩৭৯-৩৮০ পৃষ্ঠা।

৯৪. কাররাফী, তানকীহুল ফুসূল আলাল উসূল, ১৯৮ পৃষ্ঠা।

৯৫. আল মারআতু ওয়া শারাহুহা, ১ খন্ড, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা।

৯৬. তিনি হচ্ছেনঃ আলী ইবনে মুহাম্মদ আবুল হাসান ফখরুল ইসলাম আল বায়দাবী। ফিকহ, উসূল ও তাফসীর শাস্ত্রে হানাফীয়াদের প্রবীণ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। সমরকন্দের বাসিন্দা। বয্‌দ একটি দূর্গের নাম এবং এর সাথেই তিনি সম্পর্কিত। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে কানযুল উসূল ইলা মারিফাতিল উসূল গ্রন্থটি উসূলুল বাযদাবী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জুরজানের নিকটবর্তী কাশ শহরে ৪৮২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্রষ্টব্য আল আলাম, ৫ খন্ড, ১৪৮ পৃষ্ঠা ও আল জাওয়াহিরুল মাগশিয়া, ১ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা।

৯৭. আল মারআতু এর উপর লিখিত আযমিরীর ফুটনোট দেখুন।

৯৮. আল মাওয়াফিকাত, ৩ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

৯৯. আল মাওয়াফিকাত, ৩ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

১০০. আল মুস্তাস্‌ফা ১ খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা, হাশিয়াতুল আযমিরী আলাল মিরআহ ১ খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠা এবং আলমাওয়াফিকাত ৩ খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা।

১০১. আল মিসবাহুল মুনীর, ৩০৬ পৃষ্ঠা।

১০২. সূরা আন নহল, ৪৪ আয়াত।

১০৩. সূরা আল বাকারা, ২৭৫ আয়াত।

১০৪. সূরা আল বাকারা, ১৮৮ আয়াত।

১০৫. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা এটি বর্ণনা করেছেন এছাড়া আল মাওয়াফিকাত, ৩ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১০৬. ইমাম আহমদ ও ইবনে মাজা এটি বর্ণনা করেছেন, এছাড়া আল মাওয়াকিকাত, ৩ খন্ড, ৯ ও ১০ পৃষ্ঠা দেখুন।

১০৭. নাফসুত তীব' এর লেখক আহমদ আল মুকরীর কিতাব ইদাআতুদ দাজিনাহ থেকে।

১০৮. জামউল জাওয়ামে এবং তার ব্যাখ্যা সমূহ ১ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, আল মিরআতু ফিল উসূল, ১ খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

১০৯. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আয যারাকশী, মৃত্যু ৭৯৪ হিজরী, ১ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১১০. পূর্বোক্ত আল বুরহান, ১ খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত, ৩ খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা, শায়খ মুহাম্মদ আলী আসসিয়াস লিখিত তারীখ আত্ তাশরী ১৬ পৃষ্ঠা এবং শায়খ মুহাম্মদ আবু যোহরা লিখিত কিতাবুল মিলকিয়া ওয়া নাযরীয়াতুল আকদ, ৩-৪ পৃষ্ঠা।

১১১. মুসলিম বর্ণিত।

১১২. নিহাফুতুস সাউল ফী শারহি মিনহাজিল উসূল, ৩ খন্ড, ৬১৯ পৃষ্ঠা এবং ইরশাদুল ফুহুল, ৩১ পৃষ্ঠা

১১৩. বুখারী ও মুসলিম থেকে বর্ণিত।

১১৪. আদদারু কুত্নী হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণনা করেছেন।

১১৫. আল মাওয়াফিকাত, ৪ খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযীও এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

১১৬. মুস্তফা সাব্বায়ী, আস্ সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত তাশরী' ৫৩ পৃষ্ঠা।

১১৭. সূরা আন্ নজম, ৩-৪ আয়াত।

১১৮. সূরা আল হাশর, ৭ আয়াত।

১১৯. সূরা আল আহ্যাব, ২১ আয়াত।

১২০. ইবনুল হুমাম, তাইসীরুত তাহরীর, ৩ খন্ড, ২২ পৃষ্ঠা, আল মাওয়াফিকাত, ৪ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা মুকাদ্দিমা ইবনে খালদূন, ৩৮০ পৃষ্ঠা, সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্ তাশরী, ৫৫ পৃষ্ঠা এবং আল ফিকরুস্ সামী, ২৯ পৃষ্ঠা।

১২১. ইবনুল কাইয়্যেম ইলামুল মুকিয়ীন, ১ খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা।

১২২. জামে বায়ানুল ইলম, ২ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা

১২৩. আল মাওয়াফিকাত, ৪ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা এবং আল ফিকরুস সামী, ১ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা।

১২৪. মাকানাতুস সুন্নাহঃ আল মাওয়াফিকাত, ৪ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা ও আল ফিকরুস সামী, ১ খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা। মুস্তফা সাব্বায়ী লিখিত আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত্ তাশরী, ৩৪৩ পৃষ্ঠা এবং আবদুল ওহহাব খল্লাফ লিখিত উসূলুল ফিক্হ, ২২-২৩ পৃষ্ঠা।

১২৫. সূরা আল নহল, ৪৪ আয়াত।

১২৬. কাররাফী, তানকীহুল ফুসূল, ১৩৬ পৃষ্ঠা, তাইসীরুত তাহরীর, ৩ খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা, আল ফিকরুস সামী, ১ খন্ড ২৯ পৃষ্ঠা।

১২৭. ভূমিকা অধ্যায়ে প্রথম আলোচ্য সূচী দেখুন।

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামে পারিবারিক জীবন

অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ

॥ এক ॥

জীবনের প্রতি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি: ভিত্তিসমূহ

আমরা সাংস্কৃতিক সংকটের যুগে বসবাস করছি। এতে মনে হয়, সমকালীন সমাজের ভিত্তিই যেন ভেতর ও বাইর থেকে হুমকির সম্মুখীন। পরিবার যেহেতু সংস্কৃতির মৌলিক এবং সর্বাধিক সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান, তাই জোরালো ও ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ একে দুর্বল করে দিচ্ছে।

যাবতীয় লক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, ব্যাপক আকারে সংকট গভীরতর হচ্ছে এবং ইউরোপ-আমেরিকায় বিশেষত পরিবারের মতো প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়েছে, এমন কি ভেঙ্গেও যাচ্ছে। এখনকার পাশ্চাত্যে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিগুলো পুনরায় পরীক্ষণ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাঝে এর বিকল্প ভিত্তি ও কাঠামো অনুসন্ধান করার সময় এসেছে। এখনকার মানুষ যে সংকটের সম্মুখীন, তার স্বরূপ চিত্রিত করা এবং কিছু সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করাও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। আমি পর্যায়ক্রমে ইসলামে পারিবারিক জীবনের ধারণা, এর ভিত্তি, গঠন প্রণালী ও নীতিগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

আমরা ইসলামী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবার সম্পর্কে ভালো ধারণা লাভ করতে পারি শুরুতেই যদি আমরা জীবন, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে পারি।*

১. তাওহীদ : আল্লাহর একত্ব

ইসলাম আল্লাহর একত্ব এবং মহাজগতের উপর আল্লাহর অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে। আল্লাহ অস্তিত্বশীল সবকিছুর স্রষ্টা, প্রভু ও রক্ষক। সবকিছুই তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

তিনি তাঁর নবী-রসূলগণের স. মাধ্যমে মানুষের জন্য সঠিক পথ নির্দেশ প্রদান করেছেন। সকল নবী ও রসূল স. একই বাণী প্রচার করেছেন। তা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি। নারী পুরুষ সকল মানুষকে আহ্বান করা হয়েছে এমন এক জীবনের প্রতি যা পূর্ণ, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। হযরত আদম আ. নূহ আ., ইব্রাহীম আ. থেকে শুরু করে মূসা আ., ঈসা আ. ও মুহাম্মদ স. পর্যন্ত সকল নবী আল্লাহর স্বীকৃতি তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ এবং শান্তির জন্য অঙ্গীকারের সেই অভিন্ন ধর্মই পৌছে

---

*লেখক : সম্পাদক, মাসিক তরজমানুল কুরআন (উর্দু)। পাকিস্তানের একজন নন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ, কলামিস্ট ও গ্রন্থকার।

*ইংল্যান্ডের লেষ্টারে 'ক্রিশ্চিয়ান মুসলিম ডায়লগ' এর আয়োজনে 'খৃষ্ট ধর্মে ও ইসলামে পরিবারের ভূমিকা' সম্পর্কে লেখক এ প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন। শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল খৃষ্টান।

দিয়েছেন যার নাম ইসলাম। মানুষ পূর্ববর্তী নবী ও রসূলগণের শিক্ষা ও আদর্শগুলোকে সংরক্ষণ করে নি। আর এটিই হলো মানুষের ব্যর্থতা।

তাই মুহাম্মদ স. এসেছেন সেই মূলবাণী তুলে ধরতে, এটাকে প্রকৃত রূপে উপস্থাপন এবং তাকে এমন ভাবে সংরক্ষণের জন্য যাতে আল্লাহর বাণী আর মানুষের কথার সাথে মিশ্রিত হয়ে বিভ্রান্তির জন্ম দেবে না।

২. মানুষের প্রতিনিধিত্ব

তাওহীদ যদি ইসলামের আদর্শিক ভিত্তি হয়, তাহলে মানুষের প্রতিনিধিত্বের (খিলাফাহ) ধারণা ইসলামী জীবন পরিকল্পনাই কার্যক্রমের কাঠামো তৈরি করে।

আদম-হাওয়ার কথা প্রায় সকল ধর্মীয় এবং প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব বর্ণনায় বাস্তবতা ও কল্পনা পরস্পরের সাথে মিশ্রিত। আল কুরআনে যেভাবে ঘটনাটি বর্ণিত, তা ইসলামের বিশ্বদৃষ্টি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনের বর্ণনার রূপরেখা নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ পৃথিবীতে একজন খলীফা (প্রতিনিধি) পাঠানোর ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আদাম ও হাওয়াকে একই বস্তু থেকে সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা পালনের জন্য নির্ধারিত ছিলেন। এই ভূমিকা সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য তাদেরকে বস্তুসমূহের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল।

তখন তারা একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন এবং একটি নির্দিষ্ট গাছের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য আদিষ্ট হলেন। তাঁরা শয়তানের দুষ্ট বুদ্ধির ফাঁদে পা দিলেন এবং পাপ করে ফেললেন। কিন্তু পাপ করার পর তাঁরা এই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হলেন, আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং ক্ষমা পেলেন। এরপর তাঁদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা দেয়ার প্রতিশ্রুতি এবং এর অনুসরণকারীদের সাফল্যের নিশ্চয়তা তাদেরকে দেয়া হলো। আদম ছিলেন প্রথম মানব যিনি এই পথ নির্দেশনা লাভ করেছিলেন এবং বংশধরদের কাছে এটা প্রচার করেছিলেন।

এর থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপসংহারে উপনীত হওয়া যায় :

ক). মানুষের পতনের প্রতীকরূপী 'আদমের পতন'- এর কোন তত্ত্বে ইসলাম বিশ্বাস করে না। আসলে সে অর্থে ঘটেনি কোন 'পতন'। পৃথিবীতে খলীফা বা প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মানুষ পৃথিবীতে এসেছে সে মিশন পূর্ণ করতেই। এর অর্থ, নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের উত্থান ঘটেছে, পতন নয়।

খ). প্রতিনিধিত্বের ভূমিকা ও মর্যাদা মানুষকে প্রদান করা হয়েছে। নারী-পুরুষ উভয়ের উপর সমানভাবে এটা বর্তায়। এর মাধ্যমে মানবসত্তা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিন্নিধি হিসাবে নারী ও পুরুষের অপরিহার্য সমতার ভিত্তি স্থাপিত হয় সমাজে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা সত্ত্বেও।

গ). ইসলাম এই ধারণা সমর্থন করে না যে, নারী (হাওয়া যেমন আদম কে) পাপ ও অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করে। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী শয়তান আদম ও হাওয়ার 'সেখান থেকে বিচ্যুত হবার কারণ ঘটিয়েছিল।' তাঁরা উভয়েই উক্ত কাজটির জন্য দায়ী ছিলেন। উভয়ে অনুশোচনা করেছিলেন সীমালংঘনের দরুণ এবং উভয়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীতে এসেছিলেন কোন ধরনের পাপের কালিমা ছাড়া।

ঘ). মানব প্রকৃতি বিশুদ্ধ। মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে (আল কুরআন ৯৫:৪)। নারী ও পুরুষকে একই ধরনের উপাদান থেকে তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকেই জন্মগ্রহণ করে খাঁটি ও নিষ্পাপ অবস্থায়। সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচরণের ওপর। (আল কুরআন ৯৫:৫-৬ ও ১০৩:২-৩) কেউ অন্যের কাজের জন্য দায়ী হবে না। (আল কুরআন ৬:১৬৫)

ঙ). মানুষকে পছন্দের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। তাকে বাস্তবতা গ্রহণ করা কিংবা না করার স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। কিন্তু এই স্বাধীনতা থেকে সে কখনও বঞ্চিত হবে না যদি সে কোন ভুল করে কিংবা তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, তবুও না। মানব প্রকৃতির অনন্যতা মনোসামাজিক ইচ্ছাশক্তিতে নিহিত। মানুষের সম্ভাবনার মূল উৎস এটাই। সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত কিংবা সর্বনিম্ন স্তরে পতিত যোগ্যতা (বা অযোগ্যতা) সৃষ্টি করে এটাই।

চ). স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে জীবনব্যাপী বিপদের সম্মুখীন হতে হয় । শয়তানের চ্যালেঞ্জের শেষ নেই। শয়তানের এই চ্যালেঞ্জ হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আসমানী দিকনির্দেশনা রয়েছে। আদম-হাওয়ার পরীক্ষা থেকে একদিকে তাদের সৎ প্রকৃতি, অন্যদিকে ভুল করার সমূহ আশংকা প্রকাশ পায়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মানুষের জন্য আল্লাহর পথ নির্দেশনার প্রয়োজন।

ছ). মানুষ ভুল থেকে সম্পূর্ণ রূপে সুরক্ষিত নয়। এটা পছন্দের স্বাধীনতার পরিপন্থী। মানুষ ভুল করতে পারে। তার প্রায়শ্চিত্ত নিহিত রয়েছে সেই ভুলটির উপলব্ধি, এজন্য অনুশোচনা এবং সঠিকপথে ফিরে আসার মাঝে।

প্রতিনিধিত্ব বা খিলাফত থেকে এটা স্পষ্ট, আল্লাহ ইচ্ছা করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং এটা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। মানুষকে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টিকূলের অন্য সবকিছুকেই মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের পার্থিব কর্মজীবনের সূচনা হয় একটি মিশনের সচেতনতাসহ, অন্ধকারে হাতড়িয়ে নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তার সামনে আদর্শ স্থাপন করা হয়েছে। সফলতার মাপকাঠিকে বর্ণনা করা হয়েছে স্পষ্টভাবে। সঠিক পথের নির্দেশিকাগুলো প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের জীবন একটি পরীক্ষা। এটি সীমিত সময়ের জন্য। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে একটি চিরন্তন জীবনের মাধ্যমে যেখানে মানুষ ইহজীবনের কর্মকান্ডের ফলাফল ভোগ করবে। ইহকালের পরীক্ষায় নারী ও পুরুষ সমান অংশীদার। সেভাবেই তাদের বিচার করা হবে। কেউ একে অপরের ছায়া নয় বরং উভয়ে পরস্পরের সক্রিয় সহযোগী। কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ প্রত্যেকে প্রাপ্য লাভ করবে যার জন্য তারা সংগ্রাম করে। তাদের সাফল্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি একই। ঈমানদার নর-নারীগণ একে অপরের বন্ধু, একে অপরকে রক্ষা করে ভালো কাজের আদেশ দান করে, মন্দ কাজে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়। তারা নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে। তারা আল্লাহ ও তাঁর বার্তাবাহককে মান্য করে। এটা তাদের জন্যই যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে। নিশ্চিতভাবে আল্লাহ সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞানী। আল্লাহ নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বাসীদের সবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন বাগানসমূহের যার তলদেশে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত; অনন্তকাল তারা সেখানে অবস্থান করবে; উত্তম আবাসস্থল বেহেশতের বাগানে,

এবং অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে উত্তম এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে, সেটিই হচ্ছে চূড়ান্ত বিজয়। (আল কুরআন ১৬:৭১-৭২) যারা ভালো কাজ করবে নারী কিংবা পুরুষ নির্বিশেষে এবং যারা ঈমানদার, আমরা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে দেবো উত্তম জীবন; এবং নিশ্চিতভাবেই আমরা তাদেরকে পুরস্কার দেব শ্রেষ্ঠ কাজগুলোর জন্য'। (আল কুরআন ১৬:৯৮)

যেসব পুরুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং যে সব নারী আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, যেসব পুরুষ ঈমান এনেছে এবং যে সব নারী ঈমান এনেছে, যে সব পুরুষ আনুগত্য করে এবং যেসব নারী আনুগত্য করে এবং যেসব পুরুষ (সৎ কাজের ক্ষেত্রে) অধ্যবসায়ী ও যেসব নারী অধ্যবসায়ী, এবং যেসব পুরুষ বিনয়ী ও যেসব নারী বিনয়ী এবং যেসব পুরুষ দান করে ও যেসব নারী দান করে এবং যেসব পুরুষ রোযা রাখে ও যেসব নারী রোযা রাখে এবং যেসব পুরুষ সংযম পালন করে ও যেসব নারী সংযত হয়ে চলে এবং যেসব পুরুষ আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে ও যেসব নারী স্মরণ করে- আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন ও বড় পুরস্কার দেবেন'। (আল কুরআন ২:২০৮) এভাবেই কুরআনে নারী-পুরুষের আদর্শ এবং বিচারের দিনের মাপকাঠির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশিত। এই দুনিয়ায় তাদের মানবিক ভূমিকার সমতার ভিত্তিও স্থাপিত হয়েছে এর মাধ্যমে।

৩. একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

ইসলাম জীবনের সকল স্তরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে নিশ্চিত করে। ইসলাম তপস্যাবাদ, সন্যাসবাদ এবং জীবনকে অস্বীকারকারী ও ধ্বংসকারী বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার বিরোধী। ইসলাম জীবন-স্বীকৃতি এবং জীবনের পরিপূর্ণতার সপক্ষে। ইসলাম জীবনকে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ, পবিত্র ও অপবিত্র ইত্যাকার বিভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে। মানুষকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করে। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে জীবনকে বিভক্ত করাকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি বলে মনে করে। (আল কুরআন ২:২০৮) ইসলাম হলো জীবন ও বাস্তবতার একটি সমন্বিত রূপ। ইসলামের শিক্ষা জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত। আত্মিক ও বস্তুগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে। ইসলামের শিক্ষা আত্মার খোরাক যোগায় এবং আইন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণ করে। অনন্যতা হলো পুরো জীবনকে আত্মিকভাবে উন্নত করা। প্রতিটি কাজ তা নামায রোযাই হোক, অর্থনৈতিক লেনদেন, যৌন সম্পর্ক, কূটনৈতিক আদান-প্রদান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট হোক- সবকিছুই ধর্মীয় কাজ বলে গণ্য হবে যদি এসব কিছু হয় আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে এবং সেই মূল্যবোধের নীতিসমূহের ভিত্তিতে যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। এবং এগুলো তখনই অধর্মীয় বলে গণ্য হবে যদি তার বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, যৌনবিষয় ও সামাজিক প্রথা মানুষের ধর্মীয় আচরণের অংশ। জীবনের কাছে পরিপূর্ণ রূপ এবং একে পরিচালিত করতে একই নিয়মনীতি অনুশাসন মান্য করতে হবে। সে ক্ষেত্রে শরীয়াহ হচ্ছে ইসলামিক অনুশাসন যা জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিচালিত করে। হযরত মুহাম্মদ স. এর উদাহরণ হচ্ছে এমন এক মডেল যা একজন মুসলমান অনুসরণ করার চেষ্টা করে। সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন থেকে সামাজিক একজন মানুষ, পুত্র, স্বামী, পিতা, ধর্ম প্রচারক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রনায়ক, সেনাপতি, শান্তির জন্য আলোচনাকারী কিংবা একজন বিচারক অথবা রাষ্ট্র

প্রধান হিসাবে দিক নির্দেশনা সন্ধান করতে পারে তাঁর জীবন দৃষ্টান্তে। জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক। কারণ ইসলাম যাকে গতিশীলতা প্রদান করেছে গতানুগতিক ভাবে তা ধর্মীয় কাজ বলে পরিচিত। কোন কাজকে ধর্মীয় বলে পরিগণিত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মানসিকতা এবং আল্লাহ প্রদত্ত ও রসূল স. প্রদর্শিত মূল্যবোধে তা পরিচালিত কি না, সে বিষয়টি। এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের সম্পূর্ণটাই মনে তাঁর ভীতিসহকারে আল্লাহর পথে পরিচালিত হবে। সিজারের জন্য জীবনের কোন কিছু অবশিষ্ট রাখা যাবে না।

৪. সমাজের ভিত্তি হিসাবে ঈমান

ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও ধর্ম হলো সমগ্র মানব সমাজের ভিত্তি এবং এর সম্পর্ক সমূহের মূল উৎস। সামাজিক গ্রুপ ও সম্প্রদায়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্ণ, রক্ত, গোত্র ও ভৌগোলিক বিভাজনের ভিত্তিতে। কিন্তু ইসলামে বিশ্বাস বা ঈমানের মাধ্যমে এসকল বিভাজন দূরীভূত করা হয়েছে। ইসলামের প্রতি অঙ্গীকার মানুষকে শুধু আল্লাহর সাথেই নয়, এর পাশাপাশি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সাথেও একাত্ম করে তোলে। এই দুই ধরনের সম্পর্ক ঈমানের একটি মাত্র কর্ম থেকে প্রসার লাভ করেছে। ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি গোত্র ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল কিংবা আর্থ-রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা নয়, ইসলামী সম্প্রদায়ের ভিত্তি হচ্ছে ঈমানের মজবুত ভ্রাতৃত্ব বন্ধন। যে কেউ ইসলাম ধর্মের প্রতি ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই এই জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার বর্ণ, গোত্র ভাষা কিংবা জন্মস্থান যাই হোক না কেন।

এটা মানবিক সংগঠনের একটি নতুন নীতি। এটা প্রকৃতিগত দিক থেকে এবং সমগ্র মানব জাতিকে গ্রহণ করতে সক্ষম।

এই আদর্শিক সম্প্রদায়ের ধারণা শুধু একটি নৈতিক সুবচনই নয় বরং এর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত মাত্রাও রয়েছে। এটা মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন অবকাঠামো তৈরি করে। ঈমান হচ্ছে এ সিস্টেমের নীতি নির্ধারক শক্তি। এটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেয় পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত। ইসলামী সংস্কৃতি এই ঈমান থেকেই বেড়ে ওঠে যেমন করে একটি গাছ বীজ থেকে বেড়ে ওঠে। এটা কিছু মাত্রায় বহিঃশক্তি সমূহ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে বীজের সম্ভাবনাই বাস্তবেও রূপায়িত হয়ে থাকে। এটা সংগঠনের একটি নীতি। ইসলামী সমাজ ও সংস্কৃতি শুরু থেকেই আদর্শিক ও সার্বজনীন।

আমি বিশ্বাস করি, এসব বিষয়ের উপস্থাপনা ইসলামী জীবন ব্যবস্থাও বুঝাতে সহায়ক হবে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে পারা যাবে না যদি এর কিছু অংশ পৃথকভাবে পঠিত হয়। কিংবা ভিন্ন সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণে এটা অধ্যয়ন করা হয়। ইসলামী পারিবারিক প্রতিষ্ঠানকেও বুঝতে হবে এবং পরীক্ষা করতে হবে জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইসলামী সংস্কৃতির আলোকে।

॥ দুই ॥

ইসলামে পরিবার : মূলনীতিসমূহ

আমরা এখন সংক্ষেপে মূলনীতিগুলো বর্ণনা করবো যেগুলো ইসলামী পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি বর্ণনা এবং সার্বিক সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তার অবস্থানকে সংগায়িত করে।

ইলাহী ব্যবস্থাপনায় অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান

পরিবার হচ্ছে ইলাহী ব্যবস্থাপনায় অনুপ্রাণিত প্রতিষ্ঠান। এটা দীর্ঘকাল মহৎ পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ভুল- ত্রুটির মধ্য দিয়ে উদ্ভূত নয়। এটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। মানবজাতি পরিবারের সৃষ্টি। পরিবার মানব জাতির সৃষ্টি নয়। 'মানবমন্ডলী, আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে। আর এই দু'জন থেকে সৃজন ও বিস্তৃত করেছেন বহু নরনারী; আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে মনোযোগী হও। যার নামে তোমরা একে অন্যের প্রতি এবং জ্ঞাতি বন্ধনের প্রতি আবেদন জানাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন।' (আল কুরআন ৪:১)

অন্য এক জায়গায় নরনারীর সৃষ্টি এবং প্রশান্তি ভালোবাসা, দয়া, মায়া- মমতাপূর্ণ, বৈবাহিক সম্পর্ককে আল্লাহ্‌র নিদর্শনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল কুরআন ৩০:২১) বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠানকে 'রসূল স. এর পদ্ধতি' হিসাবে প্রশংসা করা হয়েছে। (আল কুরআন ১৩:৩৮) এবং রসূল স. বলেন, 'বিবাহ আমার সুন্নাহ'র অংশ, যে আমার পথ থেকে পালিয়ে যায়, সে আমার দলভুক্ত নয়।' (ইবনে মাজাহ, নিকাহ অধ্যায়)

সামাজিক চুক্তি

যদিও বিবাহ একটি স্বর্গীয় আদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকটি বিবাহের প্রকৃতি হচ্ছে এটা একটি চুক্তি। 'নিকাহ' শব্দটি কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে আকদ, যার মানে হলো চুক্তি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বিবাহকে বিশেষভাবে 'মিছাকান গালিযা' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে একটি সুদৃঢ় চুক্তি (আল কুরআন ৪:২১)। উত্তররাধিকার সূত্রে নারীর মালিক হওয়ার ইসলাম-পূর্ব প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (আল কুরআন ৪:১৯)। ইসলামের বৈধ বিবাহের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতি একটি সুস্পষ্ট শর্ত। (বুখারী শরীফ কিতাবুন নিকাহ ও আল কুরআন ২:২৩২)

ঈমান ও পরিবার

ঈমান পরিবার প্রতিষ্ঠানের মূলভিত্তি। একজন মুসলিম একজন অমুসলিমকে বিবাহ করতে পারে না। (আল কুরআন ২:২২১) বিবাহ হবে দু'জন অংশীদারের মাঝে যারা জীবন ও নৈতিকতা সম্পর্কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং এটা করে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য। প্রকৃত পক্ষে গুরুত্বসহকারে এটা বলা হচ্ছে যে, বিয়ের ব্যাপারে একটি দিক নির্দেশক মূলনীতি হবে, মন্দ পুরুষের জন্য মন্দ মহিলা আর মন্দ মহিলার জন্য মন্দ পুরুষ; ভালো পুরুষের জন্য ভালো মহিলা এবং ভালো মহিলার জন্য ভালো পুরুষ (আল কুরআন ২৬:২৬)। অবৈধ যৌন সংসর্গকারী ব্যক্তি অবৈধ যৌনসংসর্গকারী মহিলা ছাড়া অন্য কাউকে বিবাহ করবে না (আল কুরআন ২৪:৩)।

ঈমান পারিবারিক সম্পর্কের পুরো সিস্টেমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন পিতা কিংবা পুত্র একজন অমুসলিম পিতা কিংবা পুত্রের নিকট হতে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। উইল করতে পারে না অমুসলিম পুত্র বা পিতাকে। একইভাবে, যদি স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তাহলে বিবাহের চুক্তিটি বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বিবাহ শুধু যৌন সম্পর্কের একটি বিষয় নয়। এটি একটি মৌলিক ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

বিবাহ

ইসলাম বিবাহ করার আদেশ দিয়েছে এবং বিবাহ ছাড়া অন্য সকল ধরনের যৌন সম্পর্ককে করেছে নিষিদ্ধ। ইসলাম মনে করে, এই সম্পর্ক নিছক সাময়িক আনন্দের জন্য কিছুতেই হতে পারে না। এটা হবে বিবাহের মধ্য দিয়ে এবং হতে হবে এমন পন্থায় যা দায়িত্বশীল, সুপরিকল্পিত স্থিতিশীল। বিবাহ ও তার মাধ্যমে পরিবার গঠন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাঝে হওয়া উচিত। এটি কোন ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক নয়, স্থায়ী সম্পর্ক এবং একে অপরের সহযোগী হিসাবে একসাথে বসবাস করে সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য সুদৃঢ় ও অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

পরিবার প্রতিষ্ঠান মুসলিম সমাজে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা সমাজের একটি মূল একক এবং এমনভাবে সংগঠিত হয়েছে যে এটি সমাজের ক্ষুদ্ররূপ হিসাবে কাজ করে থাকে। আহকামের (আল কুরআনের আইনগত নির্দেশ) পরিবার ও পারিবারিক কানুন সম্পর্কিত ঐসব অধিকার ও দায়িত্বের (যা পরিবারের ভিত্তি) লক্ষ্য এমন আচরণ ও মনোভাব সৃষ্টি করা যাকে ইসলাম প্রচলিত করতে চায় ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে। স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা, ব্যক্তিগত বিবেচনা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যকার ভূমিকা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুসলিম পরিবার একটি সম্প্রসারিত পরিবার। এখানে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক বিভিন্ন অবস্থান লাভ করে। এটা শুধুমাত্র পিতা-মাতা ও সন্তানদেরকে নিয়েই নয় বরং পরিবারের আওতাধীন থাকে ৩/৪ পুরুষের সন্তানাদি। একটু সতর্ক দৃষ্টিতে তাকালে, ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে দেখা যায়, এ সকল সম্পর্ক মৌলিক পারিবারিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এটা মোটেও গৌণ নয় ।

নারী ও পুরুষের সমতা

ইসলাম মানব সত্তা হিসাবে নারী-পুরুষ উভয়ের সমতা স্বীকার করে। তবে কোনো ক্ষেত্রে সমাজে নারী পুরুষের স্ব-স্ব অবস্থান ও কাজের পার্থক্যকেও মেনে নেয়। ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অনুমোদন করে না। কারণ এটা পরিবারের ভূমিকার সাথে সাংঘর্ষিক। এগুলোর পরিচালনা ও উন্নয়নে যা কিছু প্রয়োজন, সে দিকে মনোনিবেশ করা। নারীর কিছু সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। কিন্তু তার প্রাথমিক দায়িত্ব হলো পরিবার সংক্রান্ত। ভূমিকা এবং কার্যাবলীর এই ধরনের বন্টন সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন এবং এগুলোর নৈতিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন স্বামীর। অপর দিকে সন্তানদের যথোপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও লালন পালন এবং সেই সঙ্গে পরিবার ও বৃহত্তর পারিবারিক সম্পর্কের অন্যান্য দায় দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায়। (আল কুরআন ৩৩:৩৩)

৷ তিন ৷

পরিবার ঃ উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী

ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পরিবাররূপী প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের কার্যাবলী আশা করে? পরিবার শুধু সন্তান সন্ততি জন্মদানের একটি কারখানা নয়। অবশ্য মানব জাতির সংরক্ষণ ও যোগোযোগ এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি সমগ্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর ভিত্তি এবং সামগ্রিক ভাবে সামাজিক, আদর্শিক ও

সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সংরক্ষণ নিশ্চিত করার স্বপরিচালিত প্রক্রিয়া। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেখতে হবে পরিবারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী কি?

ক. মানব জাতির সংরক্ষণ ও ধারাবাহিকতা

মানবিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব এবং খিলাফতের বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতা নির্ভর করে বংশবৃদ্ধি ও প্রজনন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ওপর। নারী ও পুরুষের মানসিক ও দৈহিক পার্থক্যকে পরস্পরের পরিপূরক করার মাধ্যমে প্রকৃতি এর ব্যবস্থা করেছে। বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়ার স্থিতিশীল কাঠামো দরকার। নর নারী ও শিশু- সকলের প্রয়োজন একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার হচ্ছে সেই প্রতিষ্ঠান যা এই সমগ্র প্রক্রিয়ার যত্ন নিতে পারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। কুরআনে বলা হয়েছে 'হে মানবমন্ডলী, আল্লাহর প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হও, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র প্রাণ থেকে এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন একই প্রকৃতির এবং বহু নর নারীতে বিস্তৃত করেছেন এই দু'জন থেকে'। (আল কুরআন ৪:১)

'মহিলারা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ, সুতরাং তোমরা সেখানে প্রবেশ করতে পার ইচ্ছা মত এবং যা তোমাদের জন্য তোমরা তার যত্ন নাও এবং আল্লাহর প্রতি তোমাদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হও এবং জেনে রাখ, অবশ্যই তোমাদেরকে আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে।' (আল কুরআন ২:২২৩)

খ. নৈতিক সংরক্ষণ

যৌনকামনা প্রাকৃতিক ও সৃজনশীল। এ কথা প্রযোজ্য সকল জীবের নর-নারীর ক্ষেত্রে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু অনন্যতা রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীর বেলায় এটা প্রধানত বংশ বিস্তারের উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত। মিলনের আকাংক্ষা 'সবসময়ে' কার্যকর হয় না। একটা নিজস্ব ঋতু ও চক্রদ্বারা সীমিত। এমনটি নয় মানুষের ক্ষেত্রে। তার কামনা সর্বদাই এবং আগে থেকে দৈহিক কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অথচ জৈবিক নিয়ন্ত্রণ থাকা স্বাস্থ্যের অনুকূল। সেগুলো আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্তরে। পুরোপুরি যৌন সংযম কিংবা অব্যাহত যৌনাচার কোনটাই সুষ্ঠু ও কল্যাণকর জীবন নিশ্চিত করে না। ইসলাম বিবাহ বহির্ভূত সকল ধরনের যৌন সংসর্গকে নিষিদ্ধ করেছে। মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য বিবাহের অনুমোদন দিয়েছে। ইসলাম চায় এ ক্ষেত্রে আনন্দ ও দায়িত্বশীলতা যেন 'হাত ধরাধরি করে চলে।' বিবাহের মাধ্যমে যৌনতা এবং বিবাহই পারে সকল ধরনের যৌন উদ্দীপনা নিয়ন্ত্রণ করতে। বিবাহ যৌন নৈতিকতার 'সেফটি ভাল্ব' হিসাবে কাজ করে। বিবাহের মাধ্যমে সুষমভাবে পরিপূর্ণতা ও তৃপ্তি অনুধাবন সম্ভব এবং আন্ত যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ বিবাহকে অনৈতিক ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে- 'সুতরাং তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর তাদের অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে এবং তাদেরকে বিবাহিতা রূপে স্নেহ-ভালোবাসার অংশ প্রদান কর যেন তারা সতী হতে পারে, তারা পথভ্রষ্ট না হয় এবং যেন তাদের চরিত্র নষ্ট না হয়'। (আল কুরআন ২:২৫)

অন্যত্র একই কথা পুরুষদের প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলা হয়েছে।' (এটি তোমাদের জন্য আইন সঙ্গত হবে যে) বিশ্বাসীদের পরহেজগার নারীগণ এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আসমানী কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের

পরহেজগার নারীদেরকে প্রাপ্য অংশ দিয়ে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বাস করবে- মর্যাদার সাথে, অনৈতিকভাবে নয়, অবাধ ভালোবাসা নয়'। (আল কুরআন ৫:৫)

গ. মানসিক স্থিতিশীলতা ও স্নেহ-ভালোবাসা

বিবাহের আরো একটি উদ্দেশ্য হলো মানসিক, আবেগগত আত্মিক সাহচর্য। পরিবার তার সকল সদস্যের মাঝে, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক শুধুমাত্র প্রায়োগিক সম্পর্ক নয়, বরং এটি আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং দয়া-মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা, পারস্পরিক বিশ্বাস, আত্ম ত্যাগ, সান্ত্বনা ও বিপদাপদে সাহায্যের ধারা অব্যাহত রাখে। সবচেয়ে ভালো দিকগুলো এসব সম্পর্কের বিকাশের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। নারী-পুরুষের মধ্যে যা আত্মিকভাবে সম্ভাবনাময়, তা বাস্তবরূপ পায় এবং সদগুণাবলী বিকশিত হয় কেবল পরিবারের প্রেক্ষাপটে। বৈবাহিক সাহচর্যে উভয় অংশীদার ক্রমবর্ধমান পরিপূর্ণতা সন্ধান করে থাকে। দায়, ত্যাগ তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা জন্ম নেয় এবং এসব গুণ চরিত্রের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। মানব ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ও পূর্ণতার জন্য পরিবার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ যোগায়। সে কারণ রসূল স. বলেছেন, এই পৃথিবীতে বাড়ী হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা।' বিবাহ ও পরিবারের এই ভূমিকার ব্যাপারটিকে বিভিন্ন ভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনুল কারীমে। বলা হয়েছে- 'এবং তাঁর অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন স্বামী বা স্ত্রী তোমাদের মধ্য থেকে, যাতে তোমরা তাদের ওপর নির্ভর করতে পার (লাভ করতে পার শান্তি ও স্বস্তি) এবং তিনি তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।' (আল কুরআন ৩০:২১)

অন্য এক জায়গায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার এই সম্পর্ককে বর্ণনা করা হয়েছে শরীরের সাথে পোষাকের সম্পর্ক হিসাবে। 'তারা তোমাদের পোষাক স্বরূপ আর তোমরাও তাদের পোষাক স্বরূপ।' (আল কুরআন ২:১৮৭) স্বামী-স্ত্রীর অভিন্নতা, একত্ব এবং আইনগত সমতার চেয়েও অনেক বেশি, অত্যন্ত উচিত পর্যায়ের এমন কিছুর উপর এখানে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। স্বামী ও স্ত্রীকে একে অপরের পোষাকরূপে অভিহিত করা হয়েছে। একজনকে পোষাক, অন্যজনকে দেহ রূপে অভিহিত করা হয়নি। পোষাক হচ্ছে এমন কিছু যা মানব শরীরের সর্বাধিক নিকটবর্তী বাহ্যিক জগতের এমন একটি অংশ যা আমাদের সত্তার অংশে পরিণত হয়। ঠিক একই ধরনের নৈকট্য বিদ্যমান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। পোষাক হচ্ছে এমন জিনিষ যা শরীরকে ঢেকে দেয় এবং তাকে রক্ষা করে। দম্পতিগণ একে অপরের সংরক্ষক ও অভিভাবক। পোষাক এর পরিধানকারীর সৌন্দর্য বর্ধন করে। পোষাক ছাড়া নিজেকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে এবং একে অন্যের সৌন্দর্য বর্ধন করে। এই সম্পর্ক নৈতিকতাকেও সংরক্ষণ করে এবং এই 'ঢাল' ছাড়া মানুষ অবৈধ সম্পর্কের বিপদে পড়তে পারে। এই সকল বিষয়কে সংক্ষেপে একটি মাত্র সুস্পষ্ট বাক্যে বলা হয়, 'তোমরা একে অপরের আচ্ছাদন স্বরূপ'।

ঘ. সামাজিকীকরণ এবং মূল্যবোধের সাথে পরিচয় ঘটানো

এর বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশটি ছাড়া সন্তানাদির লালন-পালন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটি হলো, তাদের শিক্ষা, চরিত্রগঠন এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করে তোলা। আর এই কারণেই পারিবারিক যত্ন নেয়া একটি পূর্ণকালীন কাজ। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যৌথভাবেও এ দায়িত্ব পালন করতে পারে না।

'এবং আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে তোমরা সচেতন হও যার নামে তোমরা একে অন্যের কাছে আবেদন জানাও (তোমাদের অধিকারের জন্য) এবং জ্ঞাতি সম্পর্কের (বন্ধনের) প্রতি।' (আল কুরআন ৪:১)

জ্ঞাতি সম্পর্ক সংক্রান্ত দায়িত্ব সচেতনতা দাবী করে স্ত্রী, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়ের প্রতি বাধ্যবাধকতা। 'এবং তার যত্ন নাও যা তোমার জন্য' সূরা আল বাকারায়' অবশ্য একই ধরনের কার্যাবলীর কথাই বলা হয়েছে। (আল কুরআন ৪:১) নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি মনোযোগী হতে বলা হয়েছে।

'হে বিশ্বাসীগণ সংগ্রাম কর যাতে অগ্নি থেকে তোমরা নিজে বাঁচ, তোমাদের স্ত্রী দেরকে বাঁচাও এবং তোমাদের সন্তানাদিকে বাঁচাও।' (আল কুরআন ৪৪:৬) একই জিনিষ মোনাজাত হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে।

'হে আমার প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানাদিকে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর করো এবং মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য'।

'হে আমার প্রভু! আমাকে সালাত আদায়কারী বানিয়ে দাও এবং আমার সন্তানদেরকেও। হে প্রভু আমার আবেদন গ্রহণ কর। (আল কুরআন ১৪:৪০)

সামাজিককরণের মৌলিক অঙ্গ হিসাবে পরিবারের ভূমিকা মহানবী হযরত মুহাম্মদের স. একাধিক হাদীসেও লক্ষণীয়। তিনি বলেন- 'প্রত্যেক শিশুই ইসলামী বিশ্বাসের (ফিতরাতের) উপর জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের পিতামাতা তাদেরকে ইহুদী, খ্রীষ্টান কিংবা অগ্নি উপাসকে রূপান্তরিত করে।'[১]

রসূল স. আরো বলেম, সব কিছুর মাঝে একজন পিতা তার সন্তানাদিকে সর্বোত্তম যা দিতে পারেন, তা হলো ভালো শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ।[২]

'এবং যে তার তিন কন্যা কিংবা তিন বোনকে ভালো শিক্ষা প্রশিক্ষণ দান করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে স্বনির্ভর করা পর্যন্ত তাদের সাথে দয়ার্দ্র আচরণ করেছে, সে নিজের জন্য বেহেশতে একটি জায়গা করে নিয়েছে।' যদিও একজনের প্রথম দায়িত্ব হলো তার সন্তানাদি এবং ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনা করা, তার পরও পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা যত্ন নিতে পারে পরিস্থিতি মোতাবেক কাছের কিংবা দূরের আত্মীয় স্বজনের। পিতা-মাতার এবং পরিবারের দুর্বল ও দরিদ্র সদস্যদের যত্নগ্রহণ কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা বারবার নির্দেশিত হয়েছে।

ঙ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামী পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পরিবাররূপী প্রতিষ্ঠান। এটি শুধু নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও আদর্শিক অধিকার নয়। পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারও। হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন 'যখন আল্লাহ তোমাকে সমৃদ্ধি প্রদান করেছেন, প্রথমে ব্যয় কর নিজের জন্য এবং তোমার পরিবারের জন্য।' পরিবার প্রতিপালন একজন স্বামীর আইনগত দায়িত্ব যদি স্ত্রী ধনী হয় তবুও। গর্ভধারিনীর জন্য ব্যয় করার সুনির্দিষ্ট আদেশ দেয়া হয়েছে। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের যাকাতের উপর অগ্রাধিকার আছে এবং পাশাপাশি অন্যান্য সামাজিক অনুদানের উপরও। ইসলাম উত্তরাধিকার আইন ও

---

১. মুসনাদে আহমদ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩১৫-৩১৬ বুখারী তাফসীর সূরানূর, মুসলিম তাকদীর অধ্যায়।
২. মিশকাত।

পারিবারিক কাঠামোর মাঝে অর্থনৈতিক দায়িত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করেছে। এই দায়িত্ব কয়েক ধরনের আত্মীয় স্বজন পর্যন্ত বিস্তৃত। কারো ধন- সম্পদের উপর তার পিতামাতা, পিতামহ- পিতামহী এবং পিতৃ ও মাতৃকূলের আত্মীয় স্বজনদের অধিকার রয়েছে। একবার একজন রসূল স. কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সম্পত্তি আছে কিন্তু আমার পিতার তা প্রয়োজন।' রসূল স. তদুত্তরে বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পত্তি সবই তোমার পিতার।' তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের অর্জিত সর্বোত্তম বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমাদের সন্তানদের অর্জন থেকে তোমরা আহার কর।'

চাচা-চাচী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীস রয়েছে। কোন পরিবারের এতিমগণ নিজের সন্তান-সন্ততি বলেই গণ্য হতে হবে। বয়স্ক সদস্যগণের দেখাশুনা করতে হবে এবং তাদের সাথে সম্মান, দয়া ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। একই ভাবে এই দায়দায়িত্ব পৌত্র-প্রপৌত্র পর্যন্ত বর্তায়। এমন কি স্বামী বা স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের অধিকার রয়েছে ধনী আত্মীয় স্বজনের ওপর। পরিবার ও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আত্মীয়তার এই বন্ধনকে সম্প্রসারিত করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে আর্থ সামাজিক সংহতি ও পারস্পরিক সাহায্যের একটি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা। এটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তারই একটা পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক আন্ত নির্ভরশীলতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলাম মনোসামাজিক নিরাপত্তার সিস্টেম প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পরিবারের সদস্যগণ এর মধ্যে থাকে ঐক্যবদ্ধ। বৃদ্ধরা যান না 'বৃদ্ধ নিবাসে'। এতিমদেরকে এতিমখানায় নিক্ষেপ করা হয় না। বেকার ও দরিদ্রদেরকে বেঁচে থাকার জন্য জনগণের সহায়তার ওপর নির্ভর করতে হয় না। বরং এই সমস্যাগুলোর সবই পারিবারিক কাঠামোর আওতায় সমাধান করা হয় এমনভাবে যা অধিক মানবিক এবং প্রত্যেকের মর্যাদা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে কেবল অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিকার হয় না; আবেগজাত চাহিদাও পূরণ করা হয়।

চ. পরিবারের সামাজিক ভূমিকা

বহুবিবাহ সম্পর্কে আল কুরআনের বিধান অত্যন্ত স্পষ্ট। সীমিত বহুবিবাহ ইসলাম অনুমোদিত যেহেতু ইসলাম বাস্তবসম্মত ধর্ম এবং এটা রক্ত-মাংসের সমন্বয়ে গড়া মানুষের জন্য। এমন পরিস্থিতি হতে পারে যেখানে বাধ্যতামূলক একমাত্র বিবাহ নৈতিক ও সামাজিক অসামঞ্জস্য এবং ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। যৌন আবেগ সকল মানুষের ক্ষেত্রে এক রকম নয় কিংবা তা নিয়ন্ত্রণের সামর্থ সকলের একই রকম নয়। আর একাধিক কারণেই একজন মানুষ এমনি একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে যে, তাকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে নতুবা পাপকর্ম করতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে বহু বিবাহ অনুমোদিত।

একইভাবে, আরো সুস্পষ্ট পারিবারিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। একটি সামাজিক উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এমন অনেক সময় আসে, বিশেষত যুদ্ধ পরবর্তীকালে যখন সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এমনি ক্ষেত্রে কিছু মহিলাকে চিরকুমারী থাকতে হয়, নতুবা পাপে লিপ্ত হতে হবে, অথবা তারা বহু বিবাহের মাধ্যমে পরিবার ব্যবস্থায় শামিল হতে পারে। ইসলাম তাদেরকে পারিবারিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা উত্তম মনে করে। এসব কিছু ইঙ্গিত দেয়, বিবাহ সামাজিক অসঙ্গতি দূরীকরণেরও মাধ্যম।

একইভাবে, পরিবার কিংবা সমাজে ইয়াতিম থাকতে পারে এবং যে স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া, মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, মর্যাদা তাদের প্রয়োজন, তা কেবল পরিবার থেকেই পেতে পারে। কুরআনের সেই আয়াতটি যেখানে বহু বিবাহের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, নাযিল হয় ওহুদ যুদ্ধের পর। এই যুদ্ধে ১০% মুসলিম সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং বিধবা ও ইয়াতীম নিয়ে সমাজে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও এই অনুমোদন সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পরিবারের কার্যাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র।

কুরআন বলেছে, 'যদি তোমরা ভয় কর যে, তোমরা ইয়াতীমদের সাথে ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে তোমরা যাদের ভালো মনে কর, সে সব মহিলাকে বিবাহ কর দুই, তিন ও চারজন পর্যন্ত এবং যদি তোমরা যাদের ভালো মনে কর যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না (একাধিক স্ত্রীর সাথে) তাহলে কেবল একজনকে রাখ অথবা যা তোমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করে, তাকে রাখ। এভাবে আশা করা যায় তোমরা অবিচার করবে না।' (আল কুরআন ৪:৩)।

বিবাহ পরিবারের মধ্যে দুর্বলের অধিকার সংরক্ষণের জন্যও উৎসাহিত করে। রসূল স. একজন তরুণের বয়স্কা বিধবাকে বিবাহ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন। ঐ তরুণের দুটি ছোট বোন ছিল এবং তাদের মা মারা গিয়েছিল। সে এমন একজনকে বিবাহ করতে চেয়েছিল যে ছোট বোন দু'টিকে লালন পালন করতে পারে এবং তাদের যত্ন নিতে পারে যথাযথ। ইসলামী জীবনধারার আওতায় পরিবার নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, আবেগের নিরাপত্তা প্রদান করে এবং আত্মীয়-স্বজনের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে ঐক্য সংহতি। এভাবে পরিবার গড়ে তোলে আর্থ সামাজিক নিরাপত্তার অত্যন্ত ব্যাপক ও অনেক বেশি মানবিক ব্যবস্থা।

ছ. পরিবারের বিস্তৃতি এবং সামাজিক সংহতি

বিবাহ হচ্ছে একজনের সম্পর্কের আওতা বিস্তৃত করা এবং সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে যেমন পরিবার, গোত্র ও জাতিসমূহের মাঝে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটা। রসূল স. বলেন, 'দু'টি পরিবার কিংবা দু জনের মাঝে বৈবাহিক গোত্রের বন্ধন যত বেশি বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করে অন্য কোনো কিছুই তা পারে না।' বিবাহ বিভিন্ন পরিবার, গোত্র ও সম্প্রদায়ের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের লোকজনকে অত্যন্ত ব্যাপক ঘনিষ্ঠ করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। বাস্তবে বিবাহ এই ভূমিকা পালন করে ইসলামের প্রাথমিক যুগে, তেমনি ইসলামের গোটা ইতিহাসে এবং পৃথিবীর সকল স্থানে।

জ. প্রয়াস ও ত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করা

পরোক্ষভাবে এটি বলা হয়েছে যে, বিবাহ কোনো ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের চেতনাকে বৃদ্ধি করে এবং তাকে জীবিকা অর্জনের জন্য আরো প্রয়াস চালাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হতে অনুপ্রাণিত করে। এই ধারণা পবিত্র কুরআনুল কারীমেও প্রতিফলিত হয়েছে। 'তোমাদের মধ্যে যাদের স্ত্রী বা স্বামী নেই তাদেরকে বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যেও যারা সৎ তাদেরকেও। যদি তারা দরিদ্র হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা তাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, সব জানেন।' (আল কুরআন ২৪:৩২) এগুলো ইসলামী সমাজে পরিবারের দ্বারা সম্পাদিত মৌলিক কাজগুলোর অন্যতম। পরিবার হচ্ছে মানব জাতির প্রজনন ও বংশ বিস্তারের মাধ্যম। পরিবার ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিকতার সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে। দম্পতি এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের আত্মিক ও আবেগগত চাহিদা পূরণ করে এবং সমাজে দয়া-মায়া, স্নেহ, প্রশান্তি বৃদ্ধি করে। নতুন প্রজন্মকে তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সভ্যতার বিবর্তনের

ব্যাপারে দীক্ষিত করে থাকে। পরিবার আর্থ সামাজিক নিরাপত্তামূলক একটি ব্যবস্থার মূলভিত্তি। এটা মানুষের উদ্বুদ্ধ হওয়া বৃদ্ধি করে এবং সামাজিক প্রগতি ও বিবিধ প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করে। পরিবার হলো সভ্যতার জন্য দোলনার মতো এবং নবপ্রজন্মের সাথে সমাজের যোগসূত্র। এটা অতীতের সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যতের এমন এক সেতু বন্ধন যার দ্বারা সুস্থ ও স্থিতিশীল প্রক্রিয়ায় সামাজিক রূপান্তর ঘটে। এভাবে এটা একদিকে নারী ও পুরুষের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের সাথে একটি শিশুর সম্পর্ক নির্ধারণের প্রক্রিয়া তৈরির উপায়; অন্যদিকে, এটা সমাজের এমন একটি মৌলিক একক যা তার সদস্যদেরকে একাত্ম করে তোলে এবং তাদেরকে বিশ্বে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালনের (বর্তমানে ও ভবিষ্যতে) যোগ্য বানায়। এটাই প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবারের তাৎপর্য। যদি এই প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পুরো সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে।

পরিবারের যথার্থ উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে নারী। ইসলামী সমাজে একজন নারী জীবিকার সন্ধানে ছোটাছুটি করার দুর্ভোগ এবং চাকরী ও কাজের দাবি পূরণের ঝামেলা থেকে মুক্ত। এর পরিবর্তে সে নিজেকে প্রধানত পরিবারের কাজে নিয়োজিত রাখতে পারে- শুধু নিজের সন্তানদের জন্যই নয়; পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সব নির্ভরশীল আত্মীয়ের জন্যও। সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থায় পরিবার পরিচালনার ব্যাপারে নারী দায়িত্বশীল। সে এর দৈহিক, আবেগজাত, শিক্ষাগত, প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রয়োজনের বিষয় দেখাশুনা করে থাকে। এসব কিছু মিলিয়ে একটা জগৎ গড়ে ওঠে। এখানে রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তিক, শারীরিক ও সাংগঠনিক কার্যাবলীর নেটওয়ার্ক। নারী এই 'জগৎ'টিকে পরিচালনা ও শাসন করে দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সহকারে।

। চার ।

ইসলামে পরিবার : কাঠামো, মূলনীতি ও বিধান

আমরা জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মূল বিষয়গুলো, ইসলামে পরিবারের ভিত্তি এবং এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। শেষ পর্যায়ে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামে পরিবার প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, কাঠামো মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে আলোচনা করব।

বিবাহ এবং তালাক

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অপরিহার্য দেওয়ানী চুক্তি। এ ধরনের একটি চুক্তি হিসাবে অন্যান্য চুক্তির মতো এটিও একটি ভিত্তির উপরে স্থাপিত। এর বৈধতা নির্ভর করে চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর সামর্থের উপর। ইসলামী আইনানুসারে যা নির্ভর করে সাবালকত্ব পারস্পরিক সম্মতির ওপর। জনসমক্ষে বিবাহ চুক্তির ঘোষণা দেয়া অপরিহার্য। আইন চুক্তির সুনির্দিষ্ট কোনো ধরন কিংবা বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব দেয় না। অবশ্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা প্রচলিত এবং সবগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয়। শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুলের উপর নির্ভরশীল। এই প্রস্তাব ও সম্মতি পক্ষদ্বয়ের মাঝে সরাসরিও হতে পারে, অথবা উভয়ের প্রতিনিধির (উকিল) দ্বারাও হতে পারে। একটি গতানুগতিক মুসলিম বিবাহে কনের সম্মতি তার প্রতিনিধি মারফত নেয়া হয়। সাধারণত একটি বিবাহ-চুক্তিতে কমপক্ষে দু'জন সাক্ষী থাকেন। আর বিবাহ উপলক্ষে আয়োজিত হয় পারিবারিক অনুষ্ঠান। স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত মোহরের বিধান রয়েছে যেটি স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে এবং তা

কেবল স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার ও কল্যাণের জন্যই। এই মোহর বৈবাহিক কার্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু বিবাহের বৈধতার জন্য অপরিহার্য নয় যে মোহরের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে আগেই। মোহরের ব্যবস্থা না থাকা বিবাহকে অবৈধ করে না যদিও প্রথানুযায়ী স্বামী তা প্রদান করবে বলে আশা করা হয়।

একটি দেওয়ানী চুক্তি হিসাবে পক্ষসমূহ তাদের ব্যক্তিগত অধিকার সমূহ বজায় রাখে। এটা করা হয় পরস্পরের ও অন্যদের মোকাবেলায়। উভয় পক্ষই নির্ধারিত বিধি মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

ইসলামে বিবাহ কোনো অস্থায়ী ঐক্য নয়। বরং সারা জীবনের জন্য। তবে বিবাহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে কিংবা সম্পর্ক কোনো ক্রমেই জোড়া লাগানো না গেলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুমোদিত। রসূল স. বলেছেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে অনুমোদিত কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক। (মিশকাত)।

বিবাহের চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পূর্বে পরিবারিক সালিশীর ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে, এই সালিশী ব্যর্থ হলে বিচ্ছেদের পদক্ষেপ নেয়া হয়।

তিন ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ রয়েছে যথা- ১. স্বামী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ (তালাক), ২. স্ত্রীর কাম্য বিচ্ছেদ (খুলা) এবং ৩. সালিশী আদালতের প্রদত্ত রায় অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ। বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত বিস্তারিত আইন কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে এবং একই ভাবে ফিকাহ শাস্ত্রেও বিধিবদ্ধ হয়েছে যাতে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মুসলিম বিবাহ সাধারণত চুক্তিবদ্ধ বিবাহ, যদিও এটি প্রথমত স্বামী-স্ত্রীর সাথে সম্পর্কিত কিন্তু এটি একই সঙ্গে দু'টি পরিবারের মাঝেও সম্পর্ক তৈরি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি। আর সে কারণে পরিবারের অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর পিতামাতা, পরিবারের আরো অধিক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিবাহে বর ও কনের সম্মতি অপরিহার্য। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ। তবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক দু'জন বিবাহের পূর্বে একে অপরকে দেখা অনুমোদিত। যার অর্থ মুসলিম সমাজে বিবাহ শুধু ব্যক্তিগত আয়োজন নয়, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়বস্তু। আর সে কারণে সমগ্র পরিবার বিবাহের আয়োজন, বাস্তবায়ন ও পূর্ণতার ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখে।

বিবাহ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পদ্ধতি

বিবাহের জন্য কোনো নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিকতা নেই। মূলনীতি হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে, বিবাহ জনসমক্ষে হতে হবে, সমাজের লোকজন যেন জানতে পারে বিবাহটি হচ্ছে। তা এমনভাবে হওয়া উত্তম যা প্রথারূপে সমাজে স্বীকৃত। সাধারণত নিকাহ (বিবাহের চুক্তি) সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্পন্ন হয়ে থাকে যেখানে উভয় পরিবারের বন্ধু বান্ধব ও স্বজনগণ উপস্থিত থাকেন। যে কোনো ব্যক্তির দ্বারা নিকাহ সম্পাদিত হতে পারে। সাধারণত মুসলিম সমাজে কাজী বলে পরিচিত ব্যক্তিরা এই দায়িত্বটি পালন করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তাঁরা কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু অংশ পাঠ করেন এবং আল্লাহর ভয়, পবিত্রতা, পারস্পরিক ভালোবাসা, আনুগত্য ও সামাজিক দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রতি স্বামী-স্ত্রীকে জানানো হয় আমন্ত্রণ। তারপর বিবাহ চুক্তিবদ্ধ হয় 'প্রস্তাব' ও 'কবুল' হয় সাক্ষীদের সম্মুখে। নিকাহ শেষে কনে বরের বাড়িতে যায় এবং জীবনের নতুন অধ্যায় তারা শুরু করে। অতঃপর স্বামী আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন

করে। এ সকল সমাবেশও ভোজের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো বিবাহকে একটি সামাজিক কার্যক্রমে পরিণত করা এবং সমাজকে এ ব্যাপারে জানানো ও সমাজের লোকজনকে এতে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। রসূল স. সকলকে এ ধরনের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর ভাবে করতে এবং পরস্পরের আনন্দে শরীক হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম বিবাহ সেটি যেখানে ঝামেলা ও ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম।' আরো বলেছেন, 'সর্বাধিক নিকৃষ্ট ভোজ হলো সে বিবাহ যেখানে শুধুমাত্র ধনী লোকদেরকে দাওয়াত করা হয় আর দরিদ্রদেরকে বাদ দেয়া হয়। যিনি বিবাহের দাওয়াত গ্রহণ করেন না, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্য। (মিশকাত)

মুসলিম পরিবারের কাঠামো

মুসলিম পরিবারের কাঠামো তিন ধরনের। প্রথম কাঠামো হলো স্বামী-স্ত্রী, তাদের সন্তানাদি, পিতামাতা (যারা তাদের সাথে থাকে) এবং যদি চাকর-বাকর থাকে, তাদেরকে নিয়ে। পরের গ্রুপটি হলো, পরিবারের কেন্দ্রীয় কাঠামো যেখানে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা যার অন্তর্ভুক্ত যদিও তারা একসঙ্গে বসবাস করে কি না সেটি বড় কথা নয়। তাদের বিশেষ দাবি রয়েছে পরস্পরের ওপর এবং তারা ঐ পরিবারে অবাধ বিচরণ করতে পারে। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। এবং তাদের মাঝে হিজাবের প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তির সম্পদ ও সম্পত্তির ওপর তাদের রয়েছে অগ্রাধিকার ভিত্তিক দাবি। ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পরও তাদের এ দাবি থাকে উত্তরাধিকারের অংশীদার হিসাবে (তারা উত্তরাধিকারিদের প্রথম সারিতে অন্তর্ভুক্ত, এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, যারা 'মাহরাম' হিসাবে গণ্য যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ। তারাই পরিবারের মূল অংশ। তারা একে অন্যের আনন্দ-বেদনা, আশা-আশংকার অংশীদার। এই সম্পর্ক উৎসারিত রক্ত সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক ও স্তন্যদান করা থেকে।

রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়রা হলেন-

১. পিতা, মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি এবং প্রত্যেক উর্ধ্বতন আত্মীয়বর্গ।
২. প্রত্যক্ষ অধঃস্তন আত্মীয়গণ যেমন- পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনী, প্রমুখ।
৩. দ্বিতীয় পর্যায়ের আত্মীয়রা। যেমন- ভাই, বোন এবং তাদের অধঃস্তন বংশধর।
৪. পিতা বা মাতার বোন (তাদের কন্যা অথবা অন্যান্য অধঃস্তন অন্তর্ভুক্ত নয়)।

বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আত্মীয় হচ্ছেন-

১. শাশুড়ী, শ্বশুর, শ্বশুর- শাশুড়ীর মাতাপিতা।
২. স্ত্রীর কন্যা, স্বামীর পুত্র অথবা তাদের নাতি-নাতনী এবং শেষোক্তদের পুত্রকন্যা।
৩. পুত্রবধু, নাত বৌ, জামাতা,
৪. বিমাতা ও বিপিতা।

কিছু ব্যতিক্রম সাপেক্ষে এ ধরনের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ স্তন্যদানকারিনী বা দুগ্ধ মাতার মাধ্যমেও নিষিদ্ধ। (আল-রিদা'আহ)।

এটাই হচ্ছে সম্প্রসারিত পরিবার এবং সম্পর্কের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রবিন্দু। এর বাইরে যেসব আত্মীয় স্বজন আছেন, তারা পরিবারের বাইরের সীমানা তৈরি করেন, বলা যায় তাদেরও নিজস্ব অধিকার ও দায়িত্ব আছে। তাদের কয়েকজনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের উত্তরাধিকারী হবার অধিকার আছে।

নারী-পুরুষের অবস্থান

পরিবারের অন্তর্নিহিত সংগঠনে একজন পুরুষ এর প্রধান ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক। প্রকৃতপক্ষে যিনি সম্প্রসারিত পরিবারের সর্বাধিক বয়স্ক সদস্য, তিনিই পরিবারের প্রধান ভূমিকা পালন করেন। একজন পুরুষের বড় দায়িত্বগুলো পরিবার-বহির্ভূত। তাকে পরিবারের আর্থিক ও বস্তুগত প্রয়োজন পূরণ করতে হয়। সমাজ, অর্থনীতি এবং নীতিগত বিষয়ের সাথে পরিবারের সম্পর্ক দেখাশুনা করতে হয়। পরিবারের শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বও তার। একজন নারীর মৌলিক দায়িত্ব পরিবারের ভিতরই সীমাবদ্ধ। এ ক্ষেত্রেও বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা সংগঠন হিসাবে পরিবারের কেন্দ্র বলে গণ্য হন। তবে পরিবারের প্রতিটি পর্যায়ে সে মহিলাই কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন যিনি এর মূল অংশ।

পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যকে এমনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে হবে যেন, ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে সবার মাঝে। কুরআনে বলা হয়েছে- 'পুরুষ নারীর কর্তা; কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে (তাদের ও পরিবারের জন্য)।' আল কুরআন ৪:৩৪

'এবং তাদের (নারীদের) একই রকম অধিকার রয়েছে পুরুষের ওপর যা হবে ন্যায়সঙ্গত, আর পুরুষরা তাদের চেয়ে একমাত্র ওপরে (সুবিধার দিক দিয়ে)। আল্লাহ শক্তিশালী, জ্ঞানী।(২১: ২১৮)।

পরিবারের সুষম সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার জন্যই এটা। এখানে রয়েছে অধিকারের সমতা এবং সুনির্ধারিত দায়িত্ব। পুরুষকে পরিবারের প্রধান করা হয়েছে যেন নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। উভয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে তারা ন্যায় বিচার ও সদবিবেচনার সাথে নিজ নিজ কার্যাবলী সম্পন্ন করে।

নারী-পুরুষের সমতা-অসমতার প্রশ্ন উঠেছে প্রায় সময়ে। এই ইস্যু হচ্ছে কিছু সাংস্কৃতিক ও আইনগত প্রেক্ষাপটের ফল। ইসলামের ক্ষেত্রে ইস্যুটি প্রযোজ্য নয় প্রকৃত পক্ষেই। ইসলামে মানুষ হিসাবে নারী-পুরুষের সমঅধিকার স্বীকার করা হয়েছে ঐশীভাবেই এবং আইনগতভাবে তা সংরক্ষণ করা হয়েছে। ভূমিকা ও দায়িত্বের বিভিন্নতা রয়েছে। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তা নারী বা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতার ভিত্তিতে নয়। জীবন বাস্তবতা ও সমাজ চাহিদার আলোকেই এটা করা হয়েছে। নিজ নিজ পরিসরে প্রতিটি ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। আর প্রত্যেক পুরুষ বা নারীকে বিচার করতে হবে তার নির্ধারিত দায়িত্ব মোতাবেক। ভূমিকাসমূহ প্রতিযোগিতামূলক নয়, পরস্পরের পরিপূরক।

পরিবার ও সমাজ

ইসলামী সমাজের একটি অংশ হলো পরিবার। ইসলাম যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেটা যৌন তাড়িত সমাজ নয়। ইসলাম একটি আদর্শিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করে যা উচ্চ নৈতিক চেতনা এবং খিলাফতের আদর্শের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ সমাজে সকল ধরনের মানব আচরণের রয়েছে লক্ষ। এর শৃঙ্খলা আরোপিত নয়। বরং প্রত্যেকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ বলেই এই শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইসলামী সমাজে সামাজিক দায়িত্ব থাকে উচ্চমাত্রায়। পুরো সিস্টেমটা এমনভাবে পরিচালিত হয় যে পরিবারকে শক্তিশালী ও সুরক্ষিত করে তোলা।

বিবাহ ছাড়া যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ করে পরিবারকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ এবং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এই মন্দ কাজের দিকে পরিচালিত হওয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করা হয়েছে। যা কিছুই যিনার পথ করে দেয়, সেটাকেই দমন ও উচ্ছেদ করা হয়েছে। যে কোনো ধরনের অবৈধ যৌনতা ইসলামে নিষিদ্ধ। হিজাব-এর ইসলামী ব্যবস্থা পরিবারকে রক্ষা করে এবং ঐ সব পথ বন্ধ করে দেয় যা অবৈধ যৌনতা, এমনকি নারী ও পুরুষকে অবাধ মেলামেশার দিকে পরিচালিত করে। ইসলাম পোষাক, আচরণ, নারী ও পুরুষের মেলামেশা এবং আরো কিছু বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান দিয়েছে।

জীবনের সূক্ষ্মগুণাবলীকে সর্বত্রভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে জৈবিক প্রেক্ষাপট বা ইন্দ্রিয় পরায়ণতা থেকে মুক্ত করে মানবজীবনের যা কিছু মহৎ ও ভালো, তার দিকে পরিচালনা করা হয়েছে। যেসব প্রভাব মানুষকে দুর্নীতিবাজ করে তোলে অথবা নৈতিকতাকে দুর্বল এবং সামাজিক আবহাওয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, সেগুলোর হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য কিছু প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে আছে নৈতিক উজ্জীবন, সামাজিক বিধিনিষেধ এবং আইন। আর এই আইন লংঘিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এসব কিছু পরিবারকে প্রতিষ্ঠানরূপে রক্ষা করে এবং ইসলামী সমাজ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার যোগ্য করে তোলে।

ইসলামের যে জীবন-পরিকল্পনা, তার প্রেক্ষাপটেই ইসলামে বিবাহ ও পরিবারের বিষয়টি অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করতে হবে। মানুষ ও পরিবার সম্পর্কে ইসলামী ধারণা এ সম্পর্কিত বর্তমান পাশ্চাত্য ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক। আমাদের কৈফিয়ৎ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কথিত মূল্যবোধ- নিরপেক্ষ যে দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চিমা জগতের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে জীবন ও মানুষের প্রেক্ষাপট গড়ে তোলে, আমরা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করি। আমরা মনে করি, সমাজে পরিবারের স্থান ও ভূমিকা এবং জীবনের লক্ষ সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি বিদ্যমান, পাশ্চাত্যে পরিবারের ভাঙ্গন আংশিকভাবে হলেও এর ফল। জীবনের লক্ষ ও মূল্যবোধ যদি সঠিক না হয়, তা হলে পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাঙ্গণ রোধ করা যাবে না। আমাদের সময়ের ট্রাজেডি হলো, প্রযুক্তিগতসহ বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক উন্নয়নের চাপে নানা প্রকার পরিবর্তন আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এর পুরো প্রক্রিয়াটিই কান্ডজ্ঞানহীন ও অনিচ্ছাপ্রসূত হয়ে ওঠেছে। যে যুগে স্বাধীনতাকে দেবতার মতো পূজা করা হচ্ছে, তখন মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতা থেকে। তা হলো, নিজের আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান ও জীবনের ধরন বেছে নেয়ার স্বাধীনতা। সবচেয়ে বড় যেসব কাজ এখনো করার বাকি, সেগুলোর একটি হচ্ছে, পছন্দ করার স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হয়ে প্রজ্ঞার সাথে এর প্রয়োগ- যাতে মানবজাতির পারিবারিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। অমানবিক ও অনৈতিক শক্তিসমূহকে (ইতিহাস বা প্রযুক্তি, যারই হোক না কেন) মানুষের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া যায় না কিছুতেই। পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে মানুষকেই নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যথায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমরা যতকিছুই অর্জন করি না কেন, আমরা একটি নতুন ধরনের দাসত্বের দিকে পরিচালিত হবো এবং মানুষকে জোর করে সরিয়ে দেয়া হবে পৃথিবীতে তার প্রকৃত ভূমিকা থেকে। আমাদের সবাইকে এটা অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে। অন্তত তাদেরকে তো করতে হবেই যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস করেন।

অনুবাদ ঃ মীযানুল করীম

ইসলামী দন্ডবিধি

ড. আবদুল আযীয আমের

।৩।

বিদ্রোহ দমনে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আর মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো,

১. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নির্মূল অভিযান পরিচালনার আগে তাদের সতর্ক করা এবং সঠিক পথে ফিরে আসার জন্য অবকাশ দিতে হবে। সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আকস্মিক দমনাভিযান চালানো জায়েয হবে না। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নির্মূল করা নয় বরং তাদের সংশোধন করা যাতে বিদ্রোহীরা সঠিক পথে ফিরে আসে। কিন্তু মুশরিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বেলায় এধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

২. বিদ্রোহীরা যতোক্ষণ মোকাবেলায় থাকে ততোক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে কিন্তু যদি যুদ্ধ ছেড়ে তারা পালিয়ে যায় তাহলে পিছু ধাওয়া করা কিংবা পলায়নরতদের হত্যা করা বৈধ নয়।

৩. আহত বিদ্রোহীদের আঘাত করা যাবে না কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় মুশরিক ও মুরতাদ বিদ্রোহী আহত হলেও তাদের উপর আঘাত করা যাবে। 'জঙ্গে জামাল' এর দিন হযরত আলী রা. তাঁর ঘোষককে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেন, 'পলায়নপর কোন বিদ্রোহীর পিছু ধাওয়া করা যাবে না এবং কোন আহত বিদ্রোহীর উপর হামলা করা যাবে না।'

৪. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে যদি কোন বিদ্রোহী গ্রেফতার হয় তাকে হত্যা করা যাবে না। পক্ষান্তরে মুশরিক ও মুরতাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে কোন মুশরিক বা মুরতাদ গ্রেফতার হলে তাকে হত্যা করা যাবে। যে বিদ্রোহীকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে, তার ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে দ্বিতীয় বার আর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত হবে না তাহলে তাকে মুক্ত করে দেয়া যাবে। কিন্তু যদি কয়েদখানায় বন্দি বিদ্রোহীর অবস্থা নেতিবাচক হয় তাহলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি দেয়া যাবে না। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিদ্রোহী ব্যক্তিদের মুক্ত করে দিতে হবে, তখন আর তাদের কয়েদ করে রাখা ঠিক হবে না।[১] পলায়ণরত বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া না করা, আহত বিদ্রোহীর উপর আক্রমণ না করা এবং বিদ্রোহী বন্দিদের হত্যা না করার পক্ষে ইমাম শাফেয়ী র. ও আহমদ র. সহ অধিকাংশ ফকীহ মত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা র. এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি এমন

কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব না থাকে, যাদের সাথে পলায়ণরত বিদ্রোহীরা পালিয়ে গিয়ে শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে তাহলে পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করাই যথেষ্ট কিন্তু যদি অন্য জায়গায় অনুরূপ কোন বিদ্রোহী গোষ্ঠী থাকে তবে তাদের পিছু ধাওয়া করে পাকড়াও করা এবং আহতদের উপর আক্রমণ চালানো এবং বন্দিদের হত্যা করা জায়েয।

কারণ এমতাবস্থায় তাদের পালাতে দিলে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সাথে গিয়ে জোট বাঁধবে এবং শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে নতুন করে যুদ্ধ বাধাবে।

ইমাম আবু হানিফা র. আরো বলেন, কোথাও যদি অবশিষ্ট কোন বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী না থাকে তাহলে ওদের পাকড়াও করে খুব পিটিয়ে বিদ্রোহ করা থেকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখতে হবে। প্রথম পক্ষের দলিল হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত 'জঙ্গে জামাল' এ দেয়া নির্দেশ। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। রসূলুল্লাহ স. তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মে আবদ্ এর ছেলে, আমার উম্মতের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করবে তার ব্যাপারে ফয়সালা কি? হযরত আবদুল্লাহ আরয করলেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল এ ব্যাপারে ভালো জানেন। অতপর রসূল স. বলেন, 'পলায়ণরত বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া করা যাবে না। আহত বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করা যাবে না, বিদ্রোহী বন্দিদের হত্যা করা যাবে না, এবং বিদ্রোহীদের সহায় সম্পদ গণীমতের সম্পদের মতো মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।' এ ছাড়াও তাঁদের দলীল হলো, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য হলো শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে তাদের বিরত করা, তাদের তাড়া করার মধ্যেই এ লক্ষ অর্জিত হয়ে যায়, তাই এদের হত্যা করা জায়েয হবে না। যেমন কোন আক্রমণকারীকে পাকড়াও করার পর হত্যা করা জায়েয নয়।[২]

গ্রন্থকার বলেন, আমার দৃষ্টিতে যে সব ফকীহ পলায়ণকারী বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া না করা এবং আহত বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ না করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের অভিমত বেশী যৌক্তিক। প্রথমত তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়ত বিদ্রোহীদের পরাস্ত করার পর পলায়ণরতদের পিছু ধাওয়া করা জরুরী নয় বরং বাড়াবাড়ি। ইসলামী শরীয়তের চেতনা এ কাজের পরিপন্থী। অবশ্য যদি পরাজিত বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে হত্যা করা ছাড়াও শাস্তিমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পথও খোলা আছে। এক্ষেত্রে মূল বিষয় হচ্ছে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা। যদি আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তাহলে তাদের শাস্তি দেয়া জায়েয।

৫. বিদ্রোহী মুরতাদ ও মুশরিকদের তৎপরতা দমন আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের মধ্যে এটিও একটি যে, বিদ্রোহীদের সহায় সম্পদ গণীমতের সম্পদ বিবেচিত হবে না এবং তাদের সন্তান সন্ততি গোলাম বাঁদী বিবেচিত হবে না। কেননা এ ব্যাপারে হাদীস রয়েছে, 'দারুল ইসলাম তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা তার নিয়ন্ত্রণাধীন সব কিছুকেই সংরক্ষণ করে এবং মুশরিকদের শাসন ব্যবস্থা তাদের অধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীন ভূখন্ডের সব কিছুকেই ভোগ্য বস্তু মনে করে।'[৩]

এর মধ্যে আরো একটি পার্থক্য হলো, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তাদের উপর গোলা বারুদ নিক্ষেপ করা যাবে না, তাদের বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ করা যাবে না, তাদের শষ্য ক্ষেত বৃক্ষরাজি পুড়িয়ে দেয়া যাবে না। কেননা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা তো দারুল ইসলামের সীমানার মধ্যেই সংঘটিত হচ্ছে। বস্তুত দারুল ইসলাম তার ভূখন্ডের সমুদয় সৃষ্টিসহ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রাপ্ত।

অবশ্য বিদ্রোহীরা যদি শান্তিকামী জনগণকে ঘেরাও করে ফেলে তাহলে শান্তিকামী লোকজন বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করতে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারবে। এমতাবস্থায় অবরুদ্ধদের অন্য বিদ্রোহীদের উপর গোলাবারুদ নিক্ষেপ এবং তাদের পাকড়াও করে হত্যা করা জায়েয। হত্যা করা ছাড়া যখন মুসলমানদের পক্ষে তাদের জীবন সম্পদ রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন আগ্রাসীকে হত্যা করা জায়েয।[৪]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে পরিস্থিতির রকমফেরে শাস্তির বিধানের ভিন্নতা ঘটে। অবস্থাভেদে শাসকগণ তাদের মৃত্যুদন্ড ছাড়া যে কোন শাস্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। যেমন বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করে তাদেরকে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখা। পরিস্থিতির জটিলতায় বিদ্রোহীদের হত্যা করাও জায়েয হয়ে যায়। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে যদি পুনরায় যুদ্ধের আশংকা হয় তবে তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করাও বৈধতা পায়। পরিস্থিতি যদি এমনই জটিল হয়ে পড়ে যে, মানুষজনের জীবনের নিরাপত্তা বিদ্রোহীদের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে আর বিদ্রোহীদের দমনে ভিন্ন কোন পথ না থাকে তাহলে তাদের হত্যা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইনের সকল শাখা প্রশাখার নানা দিক গভীর চিন্তা ভাবনা করার পর আমি (লেখক) যা বুঝেছি তা হলো, যেসব ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে যুদ্ধাবস্থায় সেই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যখন যুদ্ধ চলে তখন হত্যার জন্য পৃথক কোন প্রজ্ঞাপন জারির প্রয়োজন থাকে না। বিদ্রোহীদের দমনে হত্যা ছাড়া যখন আর কোন পথ না থাকে তখন এটিও একই পর্যায়ভুক্ত। এক্ষেত্রেও হত্যার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

কেননা, এই হত্যার অনুমতি প্রদান বিদ্রোহীদের কর্মকান্ডেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এর দ্বারা এই উপসংহারে উপনীত হওয়া যাবে না যে, বিদ্রোহীদের ক্ষেত্রে একটাই শাস্তির বিধান আর তা হলো মৃত্যুদন্ড। বস্তুত শরীয়ত তাদের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করতে চায় না, যেমনটি উপরে আলোচিত হয়েছে। তবুও বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির কারণে মৃত্যুদন্ডের প্রয়োগ হয়ে থাকে। বস্তুত উপরের আলোচনার পর একথা বলাই বেশী সঠিক হবে বলে মনে করি যে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীদের দমনে যে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে এসবই তাযির পর্যায়ভুক্ত যা কখনো মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত পৌছে। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি মনে করি, বিদ্রোহ এমন অপরাধের পর্যায়ে পড়ে না, যেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট হদ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিদ্রোহ জনিত অপরাধ একটা বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যদ্দরুন তাতে মুশরিক ও মুরতাদদের অপরাধের চেয়ে ভিন্ন ধরনের দন্ডাদেশ প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিদ্রোহের শাস্তি এক দিকে যেমন মুশরিক ও মুরতাদদের দন্ডাদেশ থেকে ভিন্ন অনুরূপ ডাকাত ও পথ দস্যুদের দন্ডাদেশ থেকেও ভিন্ন। কারণ মানুষের ধন সম্পদ লুটতরাজ করা এবং নিরপরাধ মানুষকে হত্যার কোন ইচ্ছা বিদ্রোহীদের থাকে না। তাদের তৎপরতাকে ইসলাম বিরোধী বলেও অভিহিত করা যায় না। কারণ বিদ্রোহীরাও মুসলমান এবং তাদের মুসলমানিত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় সৃষ্টি হয় না। প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহীরা সমকালীন শাসক বা শাসকদের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাদের শাসন প্রক্রিয়া ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে এবং বল প্রয়োগ করে ক্ষমতার পরিবর্তন করতে চায়। দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্যই শুধু বিদ্রোহ হয় না, অনেক সময় বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ করারও যুক্তি থাকে, থাকে তাদের দৃষ্টিতে কিছু নিয়ম আদর্শ। যে নিয়মনীতির ভিত্তিতে তারা সমকালীন শাসক বা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক তৎপরতা শুরু করে। বিদ্রোহীরা নিজেদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকান্ডকে কল্যাণকর কাজ বলে মনে করে, মহৎ উদ্দেশ্যে তারাও ইসলামের কল্যাণকামিতার দাবী করে। এজন্য তাদের উদ্দেশ্য অন্যান্য অপরাধের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রে পেশাদার অপরাধী হয় না। যদিও ইসলামী শরীয়ত শাসককে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে এবং শাসকদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের মৃত্যুও হতে পারে তবুও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাসকদের দমনাভিযানের অনুমোদন শরীয়ত এজন্য দিয়েছে যাতে বিদ্রোহীদের কারণে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা ও হাঙ্গামার অবসান হয় এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলরা স্থিতিশীল হয় এবং তাদের শক্তি সামর্থ অক্ষুন্ন রাখতে পারে। এতটুকু শক্তি যে কোন শাসকের থাকা বাঞ্চনীয় যাতে শাসকরূপে তাদের শাসন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করতে পারে। পক্ষান্তরে শরীয়ত বিদ্রোহীদের দিকটাও এড়িয়ে যায়নি, শরীয়ত বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যকেও বিবেচনায় রেখেছে, যে উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ করতে উদ্যোগী হয়।

সাধারণত বিদ্রোহীরা সমকালীন শাসককে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করতে চায়, অথবা শাসন প্রক্রিয়ায় জড়িতদের উৎখাত করতে চায়, অথবা শাসকের আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়। এসব তৎপরতা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড, দেশীয় রাজনীতি ও শাসন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। বিদ্রোহের পক্ষে বিদ্রোহীদের যুক্তি থাকে, দলীল প্রমাণ থাকে, সেসব দলীল প্রমাণ ও যুক্তি তারা জনসাধারণের কাছে প্রচার করে। যদিও তাদের যুক্তি দলীল প্রমাণ শক্তিশালী নয়, দুর্বল ও অপর্যাপ্ত তবুও শরীয়ত তাদের বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার যৌক্তিকতাকে বিবেচনা করে অন্যান্য অপরাধের তুলনায় এই অপরাধকে ভিন্ন ভাবে বিবেচনা করেছে।

উপরে আমরা একথা বুঝাতে চেষ্টা করেছি, বিদ্রোহীদের কর্মকান্ড অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুত অন্যান্য অপরাধের চেয়ে বিদ্রোহজনিত অপরাধের মূল পার্থক্য বুঝতে হবে। বিদ্রোহীরা রাজনৈতিক অপরাধী, চারিত্রিক নৈতিক অপরাধে অপরাধী নয়। কাজেই তাদের শাস্তির ক্ষেত্রে এ দিকটাকেই প্রাধান্য দিতে হবে যাতে তারা শাসকের আনুগত্য করে। শাসক ও শাসন প্রক্রিয়ার প্রতি যদি তারা আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে আর তাদের ক্ষেত্রে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। তদ্রূপ যুদ্ধাবস্থায়ও বিদ্রোহীরা যে অপরাধ করে তাও অন্যান্য অপরাধের সাথে তুলনীয় হবে না। যেহেতু তাদের যুদ্ধটাও কোন না কোন শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকেই সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই তাদের অপরাধ যুদ্ধমান মুরতাদ ও মুশরিকদের থেকে ভিন্ন। কারণ আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করা ও দীনের হেফাযতের জন্য মুরতাদ ও মুশরিকদের হত্যা করা হয়।

ডাকাত ও পথ দস্যুদের অপরাধ থেকে বিদ্রোহীদের অপরাধ এজন্যও ভিন্নতা রাখে যে, ডাকাত ও পথ দস্যুদের লক্ষ্য থাকে গণমানুষের ধন সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা ও ভীতি সৃষ্টি করা। এ ধরনের কর্মকান্ড খুবই জঘণ্য শুধু কোন অপরাধ প্রবণ লোকের দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। ফলে এ ধরনের অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যাতে মানুষের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করে এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা যায়। যদ্দরুন ডাকাত ও পথ দস্যুদের শাস্তির বিধান করা হয়েছে মৃত্যুও, শূলদন্ড

হাত পা বিপরীত দিকে কেটে ফেলা অথবা দেশান্তর কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড। এ ধরনের জঘন্য অপরাধের জন্য গুরুদন্ড হওয়াটাই সমাধান, যার ফলে মানুষের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করে আর লোকজন এ ধরনের অপরাধ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু বিদ্রোহীদের লক্ষ ও উদ্দেশ্য ডাকাত কিংবা পথদস্যুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বিদ্রোহীদের তৎপরতা সম্পূর্ণই রাজনৈতিক। বিদ্রোহীরা তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে শাসন প্রক্রিয়া ও সমাজকে গঠন করতে চায়। এর দ্বারা তারা দীন ও শাসন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটাতে চায়। বস্তুত অপরাধের লক্ষ ও উদ্দেশ্য আলাদা হওয়ার কারণে শাস্তিও আলাদা হতে বাধ্য।

কাসাসযোগ্য অপরাধ

'কাস্সা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'কর্তন করা।' এই শব্দ থেকেই কাসাস শব্দের উৎপত্তি। ইসলামী আইনে এর অর্থ কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানি কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তিস্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা।[৫]

ফকীহগণ কাসাসের সংগায় বলেছেন, কাসাস হলো কোন ব্যক্তির হক বিনষ্টের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান যা ওয়াজিব। কাসাস 'হদ' এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার ক্ষেত্রে হদ এর মতো। যেহেতু হদ এর মতো কাসাসেও শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত। কিন্তু ভিন্ন দৃষ্টিতে হদ ও কাসাসের মধ্যে রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। কারণ কাসাস বন্দার হক বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয় আর হদ আল্লাহর হক বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয়। শাস্তি সুনির্দিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে হদ ও কাসাসের মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য হলো, 'হদ' এর কোন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্যায় নেই, যে উভয়ের মধ্যবর্তী আরো বিভিন্ন পর্যায় থাকবে। কিন্তু কোন মানুষের হক বিনষ্টের কারণে যে কাসাস ওয়াজিব হয় এর মধ্যে এই অবকাশ আছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে খুনের ভর্তুকি না চেয়ে ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এমতাবস্থায় শাস্তি রহিত হয়ে যাবে কিন্তু 'হদ' কারো পক্ষে রহিত করা সম্ভব নয়।[৬]

যেসব অপরাধে আল্লাহ তাআলা কাসাস আবশ্যিক করেছেন এসবের মধ্যে ইচ্ছাকৃত নরহত্যা ও কোন মানুষের দৈহিক ক্ষতি সাধান অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে সংক্ষেপে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করবো।

স্বেচ্ছায় নরহত্যা ঃ হত্যাকান্ডের শাস্তি সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বহু নির্দেশ রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুমিনগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কাসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধি অনুসরণ করা এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমা লংঘন করে তার জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৭]

'কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারকে আমি এর প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই।'[৮]

'আমি তাদের জন্য সেখানে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই গোনাহ মোচন হবে। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই জালিম।'[৯]

শেষ আয়াতে বনী ইসরাঈলের অপরাধের কথা বিবৃত হলেও যেহেতু এই আয়াতটি মনসুখ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণিত কোন দলীল নেই সেহেতু এই আয়াতের বিধান মুসলমানদের ক্ষেত্রেও সমভাবে কার্যকর।[১০] হাদীস শরীফেও এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে 'স্বেচ্ছায় নরহত্যার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।'[১১] অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিন কারণে কাউকে হত্যা করা বৈধ। তন্মধ্যে একটি হলো, হত্যার বদলে হত্যা।[১২]

ইমাম আবু হানিফার র. দৃষ্টিতে সেটিকে হত্যাকান্ড বলা যাবে, যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কাউকে হত্যা করার জন্য এমন কোন অস্ত্র বা হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করে যা দ্বারা কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। যেমন ধারালো কোন পাথর, কোন ধাতব অস্ত্র বা এমন ধরনের বস্তু। এ ধরনের জিনিসের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, এসব জিনিস হাতে নেয়াটাই প্রমাণ করে হত্যাকারী হত্যা করার ইচ্ছায়ই এসব হাতিয়ার হাতে নিয়েছে।[১৩]

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. ইমাম আবু হানিফা র. এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, স্বেচ্ছায় হত্যাকান্ড কোন অস্ত্র দিয়েও হতে পারে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়ও মানুষের মৃত্যু অনিবার্য হতে পারে। তাঁরা কাউকে পানিতে ডুবিয়ে রাখা, গলা টিপে ধরা, কোন উঁচু জায়গা কিংবা ঘরের ছাদের উপর থেকে ফেলে দেয়া অথবা বিষ খাওয়ানোকেও স্বেচ্ছায় হত্যাকান্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এ সব উদ্যোগ তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটায় এবং হত্যাকারী জানে এ কাজ জীবন সংহারী।[১৪]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, হত্যাকারী যদি কোন ধারালো বস্তু দিয়ে হত্যা করে, যেমন লোহা বা এ জাতীয় পদার্থের তৈরী কোন জিনিস যা মানুষের দেহে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে অথবা এমন কোন জিনিস যার ভারে মানুষের মৃত্যু ঘটে যেমন পাথর, কোন ভারী কাঠ কিংবা লোহা বা ইস্পাতের ভারী জিনিস অথবা এমন কোন বস্তু যা দিয়ে হত্যাকান্ড ঘটানো সম্ভব বলে সবাই মনে করে এবং হত্যাকারী মনে করে এর দ্বারা মৃত্যু ঘটবে তবে এসবই স্বেচ্ছায় হত্যার পর্যায়ে পড়বে এবং হত্যাকারীর উপর কাসাসের দন্ড অপরিহার্য সাব্যস্ত হবে।[১৫]

উপরে উল্লেখিত প্রক্রিয়া সমূহের কোন একটিতে যদি স্বেচ্ছায় হত্যাকান্ডের শর্ত সমূহ সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে অপরাধীর উপর কাসাসের দন্ড ওয়াজিব হয়ে যাবে। অবশ্য নিহতের ওয়ারিশগণ যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আর দন্ড কার্যকর হবে না।[১৬]

কাসাস থেকে দিয়্যাতের হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে কিছুটা মতভিন্নতা রয়েছে। মতভিন্নতার মূল বিষয় হলো, দিয়্যত কি নিহতের উত্তরসূরীদের অধিকার (হক)? এ ব্যাপারে হত্যাকারী যদি দিয়্যত দিতে সম্মত না হয় তাহলে নিহতের উত্তরসূরীরা কাসাস নিয়ে অথবা দিয়্যত ছাড়াই কি হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে? ইমাম মালেক র. বলেন, নিহতের উত্তরসূরীদের এই অধিকার আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে কাসাস নিতে পারে অথবা দিয়্যত ছাড়াও হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। অবশ্য হত্যাকারী যদি দিয়্যত দিতে সম্মত হয় তাহলে দিয়্যত নিবে। ইবনে কাসিম ইমাম মালেক র. থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা র. ও অন্যান্য ফকীহদেরও একই অভিমত। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, দাউদে জাহেরী, ও আরো কিছু সংখ্যক ফকীহ বলেন, নিহতের উত্তরাধীকারদের এই অধিকার আছে, তারা দিয়্যত ছাড়াই ক্ষমা করে দিতে পারে কিংবা কাসাস নিতে পারে। অথবা দিয়্যত নিয়ে কাসাস ক্ষমা করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই। ইবনে আশহাব র. ইমাম মালেক র. থেকে এমন একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য ইমাম মালেক র. এর প্রথমোক্ত মতই বেশী খ্যাত।[১৭]

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাসাস

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ- "চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলেও কাসাস ওয়াজিব।"

'হযরত আনাস বিন মালেক রা. এর বর্ণনা। রবী'আ বিনতে নযর বিন আনাস এক বাঁদীর দাঁত ভেঙে দিলে তিনি দাঁত ভাঙার অপরাধের জন্য দিয়্যত দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাঁদীর মালিক পক্ষ দিয়্যত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো এবং কাসাস প্রয়োগের দাবী করলো। এমতাবস্থায় বিবাদীর ভাই আনাস বিন নযর রসূল স. এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলো ইয়া রসূলাল্লাহ! দাঁত ভাঙার অপরাধে কি রবীআ'রও দাঁত ভাঙা হবে? আনাস বললেন, আপনাকে যে প্রভু সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন সেই প্রভুর কসম করে বলছি, তার দাঁত ভাঙবেন না। রসূল স. বললেন, আনাস আল্লাহ তাআলাই কাসাসের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হত্যার চেয়ে কম পর্যায়ের অপরাধে দৈহিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিচারের বেলায় যতোটুকু সম্ভব কাসাস বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। নরহত্যার কাসাসের ক্ষেত্রে যে দলীল ও শরয়ী বিধান কার্যকর হত্যাকান্ডের চেয়ে নিম্নের অপরাধের ক্ষেত্রেও একই বিধান ক্রিয়াশীল। কেননা শরীয়ত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কাসাসের বিধান দিয়েছে, জীবনের মতো মানব দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা বিধানও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত নরহত্যার মতোই অঙ্গহানির ক্ষেত্রেও সমভাবে কাসাস প্রয়োগ যোগ্য হবে।[১৮] কোন অঙ্গ গোড়া থেকে কেটে ফেলার অপরাধে কাসাসের দন্ড প্রযুক্ত হবে।[১৯] অনুরূপ কোন অঙ্গের যদি এতটুকু ক্ষতি হয়ে যায় যে অঙ্গটি বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলেও কাসাস প্রযোজ্য হবে।[২০] যে আঘাতে হাড় দেখা যায় তাতেও কাসাস প্রযোজ্য হবে।[২১]

এসব পরিস্থিতিতে কাসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ক্ষতি সাধানের কারণ ছাড়াও আরো কিছু শর্ত রয়েছে। শর্তগুলোর অন্যতম হলো, যে অঙ্গের কাসাস নেয়া হবে সেই অঙ্গটি অপরের অঙ্গের সদৃশ হতে হবে। কারণ অনুরূপ অঙ্গ যাতে শাস্তি হিসেবে কাটা যায়। যাতে কাসাস নিতে গিয়ে অপরাধীর প্রতি জুলুম করা না হয়।[২২] কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অঙ্গহানীর বদলে দিয়্যত গ্রহণে সম্মত হয় তাহলে তাকে পুরোপুরি দিয়্যত দিতে হবে' যদি ক্ষতিগ্রস্ত নির্দিষ্ট একটি অঙ্গে হয়। হ্যাঁ, যে সব অঙ্গ শরীরে অন্তত দু'টি রয়েছে তন্মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্ধেক দিয়্যত ওয়াজিব হবে। আর যে অঙ্গ শরীরে চারটি রয়েছে তন্মধ্যে একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এক চতুর্থাংশ দিয়্যত দিতে হবে। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত প্রণেতার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট কোন কাসাস নির্ধারিত নেই সে সব ক্ষেত্রে জরিমানা ওয়াজিব হবে।[২৩]

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আল-মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা ৫৬ এবং আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা- পৃষ্ঠা-৩৯

২. মুঈনুল হুককাম, পৃষ্ঠা-২৮৫, এবং আশ্ শরহুল কবীর খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৮

৩. আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া, আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-৫৭ এবং আল-আহকামুস- সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা-৩৯

৪. আল আহকামুস্ সুলতানিয়া- আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা-৪০

৫. লিসানুল আরব, খন্ড-৮ পৃষ্ঠা ৩৪১, প্রথম সংস্করণ, মাতবায়ে আমিলিয়্যা, রিসালা আল কাসাস ফিশ্ শারয়িয়্যাতিল ইসলামিয়া, ডক্টর আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম, প্রকাশকাল ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ, মিসর, পৃষ্ঠা ৩৬

৬. তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানযুদ্ দাকায়েক, ইমাম যাইলাঈ, খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৯৭, প্রথম সংস্করণ, মাতবায়ে আমিরিয়া বোলাক, মিসর ১৩১৫ হিজরী। বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খন্ড-২ পৃষ্ঠা-৩৩, আল আহকামুস, সুলতানিয়্যা-আল মাওয়ার্দী পৃষ্ঠা-২১৯। আততাশরীঈল জিনায়ীল ইসলামী, আবদুল কাদের আউদা, পৃষ্ঠা ৭৮ এরপর পৃষ্ঠা ৬৬৩।

৭. আহকামুল কুরআন আল জাসসাস খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫

৮. আহকামুল কুরআন আল জাসসাস খন্ড-১ পৃষ্ঠা ১৩৬

৯. প্রাগুক্ত

১০. আলবাদায়ে আস্সানায়ে; আলকাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৩৩ শরহে আয্ যাইলাঈ আ'ল মতনিল কান্‌য খন্ড-৬ পৃষ্ঠা- ৯৭ এবং তারপর।

১১. আল কাসানী খন্ড-৬ পৃষ্ঠা ৫২ এবং তারপর।

১২. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৩

১৩. আল আহকামুস্ সুলতানিয়া আল-মাওয়ার্দী, পৃষ্ঠা ২১৯ আল মুগনী ইবনে কুদামা খন্ড-৯ পৃষ্ঠা ৩২১

১৪. শারায়েতে কাসাস, আলকাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৩৪ এবং এরপর।

১৫. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৩৩৬ আল মুগনী খন্ড ৯ পৃষ্ঠা- ৩৩৩

১৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খন্ড-২ পৃষ্ঠা ৩৩৬ আল আহকামুস্ সুলতানিয়া আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা-২৫৬

১৭. আল মুগনী খন্ড-৯ পৃষ্ঠা ৪০৯ এবং এরপর পৃষ্ঠা ৪১৬ ও তারপর।

১৮. আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা ২৬০

১৯. আল কাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা-২৬৯

২০. আল কাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ৩০৯ এবং আহকামুস সুলতানিয়া আবু ইয়া'লা পৃষ্ঠা ২৬২

২১. আলকাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ২৯৭

২২. আকাসানী খন্ড-৭ পৃষ্ঠা ৩১১ আল মুগনী খন্ড-৯ পৃষ্ঠা ৪৮০

২৩. দিয়্যতের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। দিয়্যতকে কোন সময় (Punishment) শাস্তি দেয়া বলা। দিয়্যতে বাদীর দাবীর প্রেক্ষিতে বিচারক নির্বিঘ্নে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন এবং উভয় পক্ষের মধ্যে দিয়্যতের পরিমাণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে অপরাধীকে আর্থিক শাস্তি দেয়ার পথ উন্মুক্ত হয়।

দিয়্যতকে জরিমানাও বলা হয়। কারণ অপরাধী এই টাকা মৃতের ওয়ারীসদের দিয়ে থাকে। দিয়্যতের কোন অংশ সরকারী কোষাগারে যায় না। এজন্যও দিয়্যতকে জরিমানা বলা হয়। এর দ্বারা মৃতের ওয়ারীসদের ক্ষয় ক্ষতি কিছুটা লাঘব হয়। এই দৃষ্টিতে অনেকেই দিয়্যতকে শাস্তি ও জরিমানা উভয় নামেই অভিহিত করেন। এজন্যে দেখুন-আত্তাশীরঈল জিনাঈল ইসলামী, আবদুল কাদের আউদা খন্ড-১ পৃষ্ঠা ৬৬৮, অথবা রেসালা আদদিয়াত ফিশ শারয়িয়্যাতিল

ইসলামিয়্যাহ, ডক্টর সাদেক আবু যায়দ, প্রকাশ ১৯৩৬ পৃষ্ঠা ৩। আমরা মনে করি, দিয়্যতের মধ্যে শাস্তি ও জরিমানা উভয় দিকের মিলন ঘটেছে। এজন্য দিয়্যত একই সাথে জরিমানা ও শাস্তি উভয়টির সাথে সামঞ্জস্য রাখে। অবশ্য দিয়্যত শাস্তির সাথেই বেশী সামঞ্জস্য রাখে। কারণ কাসাসের স্থলে দিয়্যত প্রবর্তিত হয়। আর কাসাস সর্বাংশেই একটি শাস্তি। অনেক ক্ষেত্রে দিয়্যতের ক্ষেত্রে শাস্তিও কার্যকর করা হয় যেক্ষেত্রে অত্যাচারিত দিয়্যত নিতে অস্বীকৃতি জানায় সেক্ষেত্রে অত্যাচারিতের দাবী ছাড়াই অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়। সর্বাবস্থায়ই দিয়্যতের মধ্যেও রয়েছে অপরাধীকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখার ক্ষমতা। এসব গুণাবলী শাস্তির মৌল বৈশিষ্ট। এক্ষেত্রে একটা কথা প্রযোজ্য যে, কাসাস মৃতের ওয়ারিসীনের অধিকার। দিয়্যতের দ্বারা শাস্তির উপাদান বিনষ্ট হয়ে যায় না। অবশ্য বলা যায় যেহেতু দিয়্যতের টাকা সরকারী কোষাগারে জমা হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে দেয়া হয়, তাই এটা নিরেট শাস্তি নয়, জরিমানাও বটে।

অনুবাদ ঃ শহীদুল ইসলাম

শরীয়াহ্ আইন সংকলন প্রক্রিয়া : ঐতিহাসিক আলোচনা

ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান

রসূলুল্লাহ্ স. ও সাহাবাগণের রা. যুগ

রসূলুল্লাহর স. যুগে ইসলাম 'জাযীরাতুল-আরব' এর বাইরে তেমন বিস্তার লাভ করেনি। সে সময় আরবদের সামাজিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ সরল। প্রয়োজন ছিল সীমিত। সমস্যা ও তার সমাধান ছিল সীমাবদ্ধ।

সে সময় যাবতীয় ব্যাপার রসূলুল্লাহর স. সাথে সম্পৃক্ত ছিল। আইন প্রণয়ন, উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ফাতাওয়া-ফারাইয, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই মহানবী স. নিজেই সম্পাদন করতেন। সে সময় স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী শরীয়াহ্ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী র. তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায়' লিখেছেন, 'রসূলুল্লাহ স. এর মুবারক জামানায় 'ফিকহ্' শাস্ত্র যথারীতি সংকলিত হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম রা. রসূলুল্লাহ্ স. কে যে কাজ যেভাবে করতে দেখতেন, তাঁর অনুসরণ করাকেই তাঁরা দীন দুনিয়ার সৌভাগ্য হিসেবে মেনে নিতেন। তাঁদের নিকট এ ধরনের কোন প্রশ্নই ছিল না যে, রসূলের কোন কাজ কোন্ মর্যাদার? কোন কাজ তিনি 'আদত' (স্বভাব) হিসেবে করেছেন এবং কোন কাজ করেছেন 'ইবাদত' হিসেবে। এসব কাজ করা জরুরী, না কি তার আবশ্যকতা নেই। যা কিছু তিনি যেভাবে করতেন, তাঁরা তাই করতেন। রসূল স. কে অনুসরণের এ ধরনটি তাঁদের নিকট জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয় ছিল।'

মহানবীর স. পরে সাহাবায়ে কিরামের জামানায় যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হতো, যে বিষয়ে রসূলুল্লাহর স. কোন কাজ বা আদেশ খুঁজে পাওয়া যেত না তখন যিনি অধিকতর জ্ঞানী, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করে তা সম্পাদন করতেন। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হল, 'তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের নিকট থেকে জেনে নাও।' (সূরা নাহল ঃ ৪৩)

পবিত্র কুরআনের এ বিধান মোতাবেক জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সরাসরি বিধানের সাথে তা মিলিয়ে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করতেন। (ফাতাওয়া ও মাসাইল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪)। সুতরাং মহানবীর স. জামানায় পবিত্র কুরআন নাযিলের মাধ্যমে ও রসূলুল্লাহর স. হাদীসের মাধ্যমে যে শরীয়া আইনের গোড়াপত্তন হয়, চার খলীফার যুগে তার (১১-৪০ হিঃ) মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়।

খোলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কিরামের যুগে উদ্ভূত যে সমস্যার সমাধান সরাসরি পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যেত না, তার সমাধানের লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শের ভিত্তিতে ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর।

করতেন। এটাকে 'ইজমায়ে সাহাবা' বলা হয়। পরবর্তীকালে 'ইজমা' ইসলামী শরীয়ার তৃতীয় উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

আর যে সকল সমস্যার সমাধানে সাহাবায়ে কিরাম ঐকমত্যে কোন সিদ্ধান্ত নেননি, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কিরাম এমন কিছু সমস্যার সমাধানে কুরআন ও হাদীসের আলোকে 'ইজতিহাদের' মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন, একে 'কিয়াসের' ভিত্তি বলা হয়। পরবর্তীতে এটিই ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

তাবেয়ীদের যুগ

পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীনে ইযামের যুগে ইসলামের আলোক রশ্মি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানগণও বিশ্বের বহু স্থানে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পৌঁছে যান। তখন দুনিয়ার নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে তাদের পরিচয় ও সংমিশ্রণের ফলে সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এমন এক ঐতিহাসিক বিবর্তনকালে, তাবেয়ীনে ইযামের যুগে একদল কুরআন হাদীস বিশারদ এবং গভীর জ্ঞান ও মনীষার অধিকারী নিবেদিত প্রাণ উলামায়ে দীন উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে এবং মূলনীতি অবলম্বনে ইসলামী আইনের এমন এক সার্বজনীন মূলনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন ও গ্রন্থণায় হাত দেন, যা সকল স্থান কাল ও পাত্রের জন্য প্রযোজ্য এবং যে কোন সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এ মূল নীতিই হলো, 'উসূলে ফিকহ্' আর এরি ভিত্তিতে সম্পাদিত আইন শাস্ত্রই শরীয়া আইন বা ফিকহ্।

উমাইয়া (৪১-১৩২ হি.) ও আব্বাসী (১৩২-১৫৬ হি.) যুগে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী আইনের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। মহানবীর স. যুগ হতে পরবর্তী দেড় শত বছর ধরে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। এ সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন ব্যাপারে সরাসরি কোন পথ নির্দেশ পাওয়া না গেলে খোলাফায়ে রাশেদীনের সিদ্ধান্ত সমূহ অনুসরণ করা হত। এক্ষেত্রেও কোন নির্দেশনা সহজ লভ্য না হলে বিচারক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে মোকাদ্দমার ফয়সালা করতেন। কিন্তু বিধিবদ্ধ আকারে কোন সংকলন না থাকায় দিন দিন মতভেদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন। 'হুজাতুল্লাহিল বালিগায়' উল্লেখিত হয়েছে যে, 'হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়াব (ওফাত ৯৫ হি.) মদীনায় এবং একই সময়ে হযরত ইবরাহীম ইব্‌নে ইয়াযীদ নাখঈ র. ইরাকে ফিকহ্ ও শরয়ী আইনের কিছু অধ্যায় সংকলন করেছিলেন। (ফাতাওয়া ও আমল ই. ফা. বা ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪)।

তবে এই মতানৈক্যের সমাধানের জন্য সর্বপ্রথম ইবনুল মুকাফ্‌ফা (মৃ. ১১৪ হিঃ/৭৬১ খৃঃ) আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মানসুরকে পত্র মারফত গোটা দেশের জন্য আইনের একটি সংকলন প্রণয়নের প্রস্তাব দেন। তিনি তাঁর পত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাতে সচেষ্ট হন। খলীফা এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

ইমাম আবু হানীফার রা. যুগ

হিজরী দ্বিতীয় শতকের চতুর্থ দশকে বিশাল আয়তনের ইসলামী বিশ্বে সরল সহজ ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুনের মোকাবিলায় পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতিদিন নতুন নতুন পরিস্থিতি ও

সংকট সৃষ্টি করে চলছিল। ইসলামী শরীয়া আইন বিধিবদ্ধ করার চিন্তা হযরত ইমাম আবু হানিফার র. মানসপটে উদিত হয় তাঁর উস্তাদ ইমাম হাম্মাদের র. এর (১২০ হি.) ইনতিকালের পর। তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা ছিল পূর্বে সিন্ধু থেকে উত্তর-পশ্চিমে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসলামী রাষ্ট্রের নগর সভ্যতা বিশাল পরিধিতে প্রসারিত হয়েছিল। স্বভাবতই তখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রশ্ন ও এতো অধিক পরিমাণ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছিল যে, একটি সুবিন্যস্ত আইন ব্যবস্থা ছাড়া উদ্ভূত সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান কঠিন হয়ে পড়ছিল। কাজেই সে সময়কার উলামায়ে কিরামের মনে এমন একটা চিন্তা উদিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল যে, ইসলামী শরীয়া আইন ও বিধি-বিধানের খুঁটিনাটি এবং শাখা-প্রশাখাগুলোকে গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত করা হোক এবং একে একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের রূপ দিয়ে সে বিষয়ে গ্রন্থাদি রচিত, সংকলিত ও সম্পাদিত হোক।

ইমাম আবু হানীফা র. ছিলেন স্বভাবজাত উদ্ভাবনী মনন এবং অসাধারণ আইন প্রণয়ন প্রতিভার অধিকারী। কালাম (দর্শন ও যুক্তি) শাস্ত্রীয় পর্যালোচনা তাঁর এ প্রতিভাকে আরও ধারালো ও পরিচ্ছন্ন করে তোলে। তাছাড়া তাঁর বাণিজ্য বিস্তৃতির কারণে লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেশের দূর প্রান্ত থেকে আগত ফাতাওয়া প্রার্থীদের চিঠিপত্রের কারণেও এর তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। বিচার বিভাগের কাজীগণের সিদ্ধান্ত ও আদেশ নিষেধে ভ্রান্তিও এই প্রয়োজনের তীব্রতাকে আরও প্রকট করে তোলে। পরিস্থিতির এ তীব্রতার কারণে হযরত ইমাম আবু হানীফা র. ১৩২ হিজরীতে এ মহতি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সঙ্গী সাথী ও শাগরিদগণ সমন্বয়ে একটি মজলিস গঠন করেন। এরই মাধ্যমে তিনি ইসলামী শরীয়া আইন সংকলন ও বিধিবদ্ধকরণ এবং এর সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকে ইমাম আবু হানীফা র. ও তাঁর সহচরবৃন্দ ইসলামী শরয়ী আইন বিধিবদ্ধকরণ ও গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরা কেবল সমকালে উদ্ভূত সমস্যার আইনগত সমাধান পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং ভবিষ্যতে কি ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এবং তার সমাধানই বা কি হতে পারে তাও তাঁরা গবেষণা করে স্থির করে তার আইনগত সমাধান নির্ণয় করেন। পরবর্তীকালের হানাফী ফকীহগণ তাকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আব্বাসী, উসমানী ও মুগল শাসনের দীর্ঘ সময়ে হানাফী ফিকহ্ অনুসৃত হলেও তার পূর্ণাঙ্গ ও সুসংহত কোন সংকলন তখন পর্যন্ত সংকলিত হতে পারেনি।

মোগল সরকারের যুগ

হিজরী ১১শ/খৃষ্টাব্দ ১৭শ শতকে সর্ব প্রথম মোগল সম্রাট আওরংগযেব আলমগীর সিংহাসনে আরোহণের চার বছর পর একটি রাজকীয় ফরমানের সাহায্যে ইসলামী আইনের একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রণয়নের নির্দেশ জারী করেন। একাজ সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তৎকালীন প্রখ্যাত ভারতীয় ফকীহগণের সমন্বয়ে এবং স্বনামধন্য আলেম নিজাম উদ্দিন বুরহানপুরীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি আট বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইসলামী আইনের একটি সুবৃহৎ সংকলন প্রণয়ন করেন। এর নামকরণ করা হয়- "ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী"। আরবীতে একে ফাতাওয়ায়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত এটিই ইসলামী আইনের সর্বপ্রথম সংকলন।

উসমানী সরকারের যুগ

আইনের পাশ্চাত্য বিন্যাস অনুসরণ করে ইসলামী আইনকে ধারা-উপধারা ও ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সাজানোর জন্য তুর্কী উসমানী সরকার ১৮৬৯ সালে সা'আদাত পাশার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ১৮৫১ টি ধারা সম্বলিত ইসলামী দেওয়ানী আইনের একটি সংকলন প্রণয়ন করে; এটি 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদালিয়্যাহ' নামে পরিচিত।

এই সংকলনটি প্রধানত 'ফাতাওয়া আলমগীরীকে' ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে রচিত হয়েছে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যে এটি বলবৎ থাকে। এরপর আর কোন শাসকই ইসলামী আইনকে আধুনিক পদ্ধতিতে বিন্যাসের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। অবশ্য পাকিস্তানে ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর অধীনে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ড. তানযীলুর রহমান ধারাবাহিকভাবে ইসলামী আইনের আধুনিক বিন্যাসে রত আছেন। যার নামকরণ করা হয়েছে 'মাজমুয়াহ কাওয়ানীনে ইসলামী'।

বাংলাদেশ ও ভারত উপমহাদেশ

এখন পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কোথাও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিধান বিধিবদ্ধ করা হয়নি। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তিউনিসিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে খন্ডাকারে ইসলামী আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে মাত্র। বাংলাদেশে মুসলিম পার্সোনাল ল' নামে কয়েকটি বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন বিদ্যমান। কিন্তু সেগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি ইসলামী আইন অনুসারী নয়। যেমন বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলা অমুসলিম বিচারক বিচার করতে পারেন এবং সে বিচারে ইসলামী সাক্ষ্য আইনের ব্যবহার নেই।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক একটি সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' নামে ১৯৯০ সাল থেকে ইসলামী আইনের বিধিবদ্ধকরণ নামক একটি প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে এর ৩টি খন্ডও প্রকাশিত হয়েছে।

উন্নত বিশ্বে আইন বিধিবদ্ধকরণের দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি এ্যাংলো স্যাকশন অন্যটি কনটিনেন্টাল। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বিশ্বের বৃহত্তর এলাকায় প্রথম ধারায় এবং ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে দ্বিতীয় ধারায় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশে ইসলামী আইনের বিধিবদ্ধকরণ প্রকল্পের সম্পাদনা পরিষদ অধিকতর উন্নত ও অধিক পরিচিত বিধায় তাদের বিধিবদ্ধকরণে প্রথম ধারার অনুসরণ করছে। আর আইনের বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রচলিত কমন 'ল ও স্টাটুটরি 'ল' এর মধ্যে ইসলামী আইন দর্শনে গ্রহণীয় দ্বিতীয় ধারা স্টাটুটরি 'ল এর ধারা বাংলাদেশে অনুসরণ করা হচ্ছে (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম খন্ডের ভূমিকা)। বেসরকারী ভাবেও 'ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ' ইসলামী শরয়ী আইনকে আধুনিক প্রেক্ষাপটে বিন্যস্ত করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। তবে সরকারও রাষ্ট্রের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তা পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়। একটি বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনের আধুনিক সংকলন প্রণয়নের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের সমন্বিত উদ্যোগ সময়ের অপরিহার্য দাবী। সময়ের দাবী পূরণে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন।

আইন বিজ্ঞানের ইতিহাস

ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

আমাদের বিশ্বাস তথা কুরআন ও হাদীসের সূত্র সম্পর্কে নতজানু নীতি অবলম্বন (apologetic) করার কোন প্রয়োজন নেই। গভীরতর যত্ন ও নির্ভুলতায় বিশ্বাসের এমন কোন মৌলিক অর্জন নেই যা নিয়ে বিশ্বের অপর কোন জনগোষ্ঠী গর্ব করতে পারে। এখন আমরা কেমন করে ইসলামী আইন উদ্ভাবিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করবো, যা এখনও দু'টি মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। হাদীস মহানবীর স. বাণী। রসূলের ওপর যা নাযিল হয়েছে নিজস্ব শব্দ চয়নে তিনি তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সেগুলিই হাদীস। কিন্তু যদি কোন সমস্যার কুরআন ও হাদীস উভয়ের দ্বারা সমাধান না হয় তাহলে কি করা হবে? মুআয ইবনে জাবাল রা. ইয়েমেনের গভর্ণর হবার সময় তাকে দেয়া নবীর স. নির্দেশনায় এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছিল। তিনি সুপরিচিত সাহাবী। তিনি যদি দীর্ঘদিন বাঁচতেন, তাহলে হয়তো ইসলামের সবচেয়ে বড় বিচারক (jurist) হতেন। ইয়েমেন রওনা হবার প্রাক্কালে নবী স. তাঁকে সাক্ষাত দান করেন। নবী স. তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কাছে যে সব মোকদ্দমা বা বিষয় উপস্থাপিত হবে, তুমি সে সম্পর্কে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবে?' 'আল্লাহর কিতাব দ্বারা' জবাব দেন তিনি। জবাব ঠিক ছিল, কিন্তু নবী স. জিজ্ঞেস করেন, 'এতে যদি তুমি উত্তর খুঁজে না পাও তাহলে?' মু'আয ইবনে জাবাল বলেন, 'রসূলের স. সুন্নাহ দ্বারা।' এ জবাবও সঠিক ছিল। কিন্তু নবী স. আবারও বলেন, 'সেখানেও যদি তুমি জবাব খুঁজে না পাও?' তিনি জবাব দেন, সে ক্ষেত্রে তিনি তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন এবং সমাধান বের করবার চেষ্টা করবেন। রসূল স. এই জবাব পেয়ে সন্তুষ্ট হন। আসমানের দিকে হস্ত উত্তোলন করে তিনি ঘোষণা করেন, 'হে আল্লাহ! তোমার দূত নিয়োজিত দূতের জবাবে আমি খুশি।' তিনি সঠিক পথে নিজের চিন্তাধারা পরিচালিত করে ইয়েমেনে রসূলের স. দূত হিসাবে তার নিযুক্তিকে যথার্থ প্রমাণ করলেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস সকল মানবিক চাহিদা মিটাতে অক্ষম বলে যদি প্রতীয়মান হতো, তাহলে মুসলিম উম্মাহ্ সম্ভবত অসহায় বোধ করতো। কিয়ামত পর্যন্ত যে বিশ্বাস টিকে থাকবে তার জন্য এটি হতো সার্বিকভাবে অনুপযুক্ত। একারণেই নবী স. কুরআন ও হাদীসে কোন পরিস্কার সিদ্ধান্ত পাওয়া না গেলে ব্যক্তিগত রায় (ইজতিহাদ) খাটানোর পরামর্শ দেন।

আইনের ধারণা

ফিকাহ্ একটি আরবী শব্দ যার অর্থ 'বুঝাতে পারা' এবং এর প্রায়োগিক অর্থ 'আইন'। কুরআনে আইনের ধারণা সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে- 'ভালো শব্দের উপমা একটি ভালো গাছের সঙ্গে হতে পারে যার

** লেখক : জন্ম হায়দারাবাদ, ভারত। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম মনীষী ও গবেষক এবং কয়েকটি কালজয়ী গ্রন্থের লেখক।*

মূল মজবুত এবং যার শাখা প্রশাখা আকাশে পৌঁছে যায়।' (১৪:২৪)। অন্য কথায় আইনের সূত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র বীজ কিন্তু এটি থেকে বের হওয়া গাছ আকাশের দিকে উঠে যায় এবং এর শাখা প্রশাখা সবকিছু আবৃত করে ফেলে। আমরা যদি কুরআন ও হাদীসকে মূল (শিকড়) ও বীজ মনে করি তাহলে এটা হচ্ছে ঠিক তাই। আমরা দেখবো যে এ থেকে অঙ্কুরিত গাছটি প্রসারিত শাখা প্রশাখাসহ এতই বলিষ্ঠ যে সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত এটা মানব জাতির সকল চাহিদা পূরণে সক্ষম। এবং এটা অবশ্যম্ভাবী যে শাখার পর শাখা বিস্তার করে গাছটি অনবরত বেড়ে উঠতে থাকে। এর বেড়ে ওঠা থেমেও যায় না বা অপরিবর্তিতও থাকে না।

ইসলামী আইনের সাথে অন্যান্য সভ্য জাতির আইনের একটি প্রাথমিক তুলনা দিয়ে শুরু করাই যথাযথ হবে। ইতিহাসবিদদের মতে, রোমানরা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা। এ ক্ষেত্রে অন্য কোন জাতি তাদের সমকক্ষ বিবেচিত হয়নি। ইউরোপকে নিয়ে চিন্তা করলে হয়তো এই দাবি সঠিক ছিল। গ্রীকরা জ্ঞানের দিক দিয়ে তাদের থেকে এগিয়ে থাকলেও আইনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। সুতরাং স্বীকার করতে হবে যে আইনের ক্ষেত্রে ইউরোপে রোমই ছিল অগ্রগামী।

রোমান আইনের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ কলিনেট (Colinet) বলেছেন, শুরুর দিকে রোমান আইন সেকেলে ছিল। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে রোমানরা এশীয় আইন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কারণ তারা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এসব দেশের সংস্পর্শে আসে সবচেয়ে বেশী। প্রাচীনতম রোমান আইন প্রণেতা গস (Gaius) ছিল এশিয়া মাইনরের অধিবাসী। এই স্থানটি এখন তুরস্ক। তিনি ইউরোপীয় ছিলেন না। পরবর্তীতে রোমান আইন আরো ব্যাপকতা লাভ করে। কারণ রোমান সাম্রাজ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ পর্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে। রোমানরা বিভিন্ন জাতিসত্তাকে তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসার ফলশ্রুতিতে তাদের আইনে নতুন নতুন ধারা যোগ করতে হয় এবং নতুন পরিস্থিতির চাহিদা মেটানোর জন্য সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়। জাস্টিনিয়ান রসূলের স. জন্মের কয়েক বছর আগে মারা যান। তিনি সংশোধিত আকারে রোমান আইনের সার গ্রন্থ রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন। জাস্টিনিয়ানের আইন গ্রন্থের সাথে আমরা ফাতওয়ায়ে 'আলমগিরী'র* তুলনা করতে পারি।

আওরঙ্গজেব আলমগীর (মৃত্যু ১৭০৭) নিশ্চিতভাবে জ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কিন্তু বিশিষ্ট পন্ডিত ছিলেন না। জাস্টিনিয়ানের বেলায়ও একই কথা খাটে। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান রাজা ছিলেন তবে কোন অবস্থাতেই আইনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। তিনি পন্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং সাম্রাজ্যের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানান, যার কতকগুলো পূর্ব থেকেই অসংগতিপূর্ণ ছিল। এভাবেই রোমান আইন গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইউরোপের জন্য এটা ছিল বিরাট গৌরবের ব্যাপার।

রোমান আইন নিশ্চিতভাবেই চিত্তাকর্ষক ছিল। এর অনেকগুলো বিষয় ছিল যা এখনও প্রয়োগযোগ্য এবং এগুলোর পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। এই আইনের ভিত্তি হচ্ছে মানুষ আইন প্রণেতা। অর্থাৎ অন্য মানুষের দ্বারা প্রণীত কোন আইন একজন মানুষ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে। ফল হচ্ছে মানুষের প্রণীত আইনে স্থিতিশীলতার অভাব রয়েছে। ইতিহাসবিদরা বলেছেন, তার রাজত্বকালের খারাপ ত্রিশ বছরে জাস্টিনিয়ান নিজেই তার নিজের তৈরি আইনে এতই সংশোধন করেছেন যে স্বীকৃতির সাথে সাথেই তা

---

*মোগল বাদশা আওরঙ্গজেব বিশেষজ্ঞ পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, যারা ইসলামী আইনের একটি সার গ্রন্থ সংকলন করেন। এটিই ফাতওয়ায়ে আলমগিরী নামে পরিচিত। সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য এ আইন দ্বারাই শাসিত হতো।

সংশোধন করা হয়েছে। অন্যদিকে আল্লাহ প্রদত্ত বিধিকে যদি আইনের ভিত্তি করা হয়, তাহলে তা স্থিতিশীল, স্থায়ী ও টেকসই হয়, যে গুণাবলী মানুষের প্রণীত আইনে আশা করা যায় না। সকল মানুষই সমান। তারা তাদেরই মতো অন্য কোনো মানুষের তৈরি আইনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এমন কি তারা তা বর্জনও করতে পারে। একই দৃশ্যের অবতারণা হয় দেশে দেশে।

মহানবী স. যখন তাঁর মিশন নিয়ে ব্যস্ত বিশ্ব তখন রোমান আইনের চেয়েও উন্নততর সারগ্রন্থ তৈরির বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জ নবী স. গ্রহণ করেন এবং আইনের একটি সার সংক্ষেপ গ্রন্থ তৈরি করেন, বাস্তবে যা জাস্টিনিয়ানের (তৈরি আইন গ্রন্থের) চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। আইনের মতো এর খারাপ দিক ছিল না বরং তা বলিষ্ঠ টেকসই ও স্থিতিশীল ছিল। রোমান আইন ইসলামী আইনের তুলনায় পরিসর ও ব্যাপকতার দিক থেকে শূন্যের পর্যায়ে ছিল। উদারহণ স্বরূপ, জাস্টিনিয়ানের আইনের গ্রন্থ, মানুষের ধর্মীয় চাহিদাকে আমলে নেয় নি এবং সর্বাংশে প্রার্থনা ও ধর্মাচরণকে বাদ দিয়ে গেছে। একই ভাবে, ইসলামী আইনের অনেক দিক সুস্পষ্ট থাকলেও রোমান আইনে তার অস্পষ্টতা লক্ষণীয়।

যে কোনো ব্যক্তি এই দু'টি আইন তুলনা করলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে নিশ্চিত ভাবেই ইসলামী আইন উৎকৃষ্ট।

ইসলামী আইনের উৎস

ইসলামী আইন হচ্ছে আল্লাহর আদেশ যা মহানবীর স. ওপর নাযিল হয়। নাযিল হওয়া বিষয়গুলোর অংশ বিশেষ নবী স. ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে এটা আল্লাহর বাণী। এটাকেই কুরআন বলা হয়। নবী স. এগুলো মুখস্থ করেন এবং নামাযের সময় তা তেলাওয়াত করার জন্য তাঁর অনুসারীদের নির্দেশ দেন যাতে তারা তা ভুলে না যায়। তিনি আরো কিছু নির্দেশও দেন। কুরআন মোতাবেক (৫৩:৩-৪) দেখুন) এই নির্দেশও আল্লাহ'র হুকুম নাযিলের ভিত্তিতেই দেয়া হয় কিন্তু তা কিতাবের (কুরআনের) অংশ হয় নি। এগুলোকেই সুন্নাহ বলা হয়।

আল্লাহর আদেশ ও রসূলের নির্দেশাবলী অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ রাতারাতি সংকলিত হয়নি। কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে তেইশ বছর ধরে। হাদীসের ক্ষেত্রে এমনটিই সত্য। কিন্তু শুরুতে, সূরাহ আল-আলাক'-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত ছাড়া কোন আইনগত দিক নির্দেশনা ছিল না। তাহলে তখন প্রথম দিকের নওমুসলিমদের জন্য কি আইন ছিল? জবাব সহজ। ইসলামের নীতি হচ্ছে একটি কাজ যা নিষিদ্ধ নয় তাই আইন সম্মত। অন্য কথায়, পুতুল পূজা ছাড়া সমসাময়িককালের সামাজিক জীবনের অন্য সকল রীতি-নীতি অনুমোদিত ছিল। প্রথম দিকের মুসলমানগণ মদ পান করতে পারতো কারণ তখনও তা নিষিদ্ধ হয় নি। শুরুতে ইসলামী আইন ও সরকার প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই শুরু হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে প্রচলিত আইন সংশোধন ও পরিবর্তন করা হয়। কুরআন ও হাদীসে বিধৃত আদেশ নির্দেশ অনুযায়ী তেইশ বছর সময় ধরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাক-ইসলামী রীতি-নীতি পরিবর্তন ও বাতিল করা হয়।

এটা স্পষ্ট যে প্রচলিত আইনের প্রথম উপকরণ যেটাকে বিদায় দেয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে পুতুল পূজা। পুতুল পূজা বাতিল করা হয়। প্রতিমা পূজা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। একত্ববাদের নীতির ব্যাপারে কোন ছাড়

দেয়া হয় নি এবং কারো সঙ্গে এক আল্লাহর ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব বরদাস্ত করা হয় নি। বিশ্বাস বা ঈমান ছিল মৌলিক বিষয়। ইসলামের বৈশ্বিক মতবাদ শুধু এই বিশ্বকে নিয়েই নয় পরকালকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দায়িত্বের নীতির অর্থ হচ্ছে মানুষ পুনরুত্থিত হবে, হিসাব চাওয়া হবে এবং সে অনুসারে পুরস্কৃত করা বা শাস্তি দেয়া হবে।

অদৃশ্য আল্লাহ এবং পুনরুত্থানের দিনের (কেয়ামতের) ওপর বিশ্বাস ঈমানের প্রধান স্তম্ভ। আমরা যদি আল্লাহর একত্বে, কে আমাদের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা এই বিষয়ে বিশ্বাসী হই তাহলে তাঁর প্রতি আমাদের কিছু কর্তব্য থেকে যায়। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের কর্তব্য কিভাবে পালন করবো? এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ আমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়, আমরাই বরং তাঁর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এই দায়িত্ব পালনে, প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। একেবারে শুরুর দিকে, মুসলমানদের নির্ধারিত কিছু বিশ্বাস ও প্রার্থনার প্রতি অবিচল থাকার প্রয়োজন হয়। সময়ের সাথে সাথে অন্যান্য প্রয়োজনগুলো ধীরে ধীরে এতে যোগ হয়।

ইসলামী আইনের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। শুরুর দিকে মক্কার রীতি-নীতিও একটি উৎস ছিল কিন্তু সেগুলো ছিল অস্থায়ী প্রকৃতির। কারণ কুরআন ও হাদীসের এই রীতি-নীতি অতিক্রম ও বাতিল করার ক্ষমতা ছিল। যে কোনো ক্ষেত্রেই এগুলোর অবাধ্যতামূলক ও অস্থায়ী চরিত্র ছিল। এ সকল সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে স্থানীয় রীতি-নীতিই আইনের প্রথম উৎস ছিল, যার স্থলাভিষিক্ত হয় স্থায়ী উৎস-কুরআন ও হাদীস। মু'আয ইবনে জাবালের সঙ্গে সম্পর্কিত রীতি-নীতি থেকে এটা স্পষ্ট যে নবীর স. জীবিতকালেই তৃতীয় উৎসের মর্যাদা পায় ইজতিহাদ।

আইন-বিজ্ঞানের বইগুলোতে আরো এক উৎসের উল্লেখ রয়েছে। সেটি 'ইজমা' বলে উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ একটি ইস্যুতে উলামার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। নবীর স. জীবনকালে এটার অবশ্য প্রয়োজন হতো না। কারণ উত্থিত প্রতিটি সমস্যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক ও চূড়ান্ত ছিল। সম্ভাব্য সর্বসম্মতিতে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে আলেমদের মধ্যে আলোচনার প্রশ্নই আসতো না।

এই উৎসগুলো ছাড়াও আরো একটি উৎস ছিল যা নবীর স. জীবনকালে চালু ছিল এবং তাঁর ওফাতের পরও চালু থাকে। এই উৎসকে 'পারস্পরিক চুক্তি' নামে অভিহিত করা হয়। যদি আমরা অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হই এবং তার সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনা করি। চুক্তির মেয়াদের জন্য শর্তাবলী বাধ্যতামূলক হতো। সেটা আমাদের আইনের অংশে রূপান্তরিত হতো। অন্যকথায়, পারস্পরিকভাবে সম্মত চুক্তির বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতা, চুক্তির মেয়াদকালে ইসলামী আইনের অংশ হয়ে যায়।

পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিও হচ্ছে আইনের আরেকটি উৎস। রসূলের স. আমলের এর একটি উদাহরণ খুঁজে বের করতে আমরা সক্ষম হইনি। সর্বাগ্রে যে উদাহরণটি পাওয়া গেছে সেটি হযরত ওমরের রা. আমলের। সীমান্ত এলাকায় নিযুক্ত তাঁর একজন গভর্ণর খলিফা ওমরের কাছে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন যে, সীমান্তের ওপারের কিছু সংখ্যক বাইজান্টাইন ব্যবসায়ী একটি বাণিজ্যিক মিশনে (এই) দেশ ভ্রমণ করতে চায়। তাদের ওপর কর আরোপের ভিত্তি সম্পর্কে তিনি জানতে চান। গভর্ণর ইসলামী কর সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি কুরআনে খুঁজেছেন কিন্তু সেখানে এ ধরনের কোন করের উল্লেখ তিনি পান নি। খলিফা ওমর এই মর্মে তার জবাব দেন যে করারোপের হার তেমনটিই হবে যেমনটি বাইজান্টাইন সফরকালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আরোপিত হয়। তখন এটাই হয় পারস্পরিক সম্বন্ধ

সম্পর্কিত আইন। এই ইস্যুতে বাইজান্টাইনের সঙ্গে কোন চুক্তি ছিল না, কিন্তু খলিফা রায় দেন যে বাইজান্টাইনী ব্যবসায়ীদের ওপর কর এতটুকুই হবে যতটুকু করারোপ করা হয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর তাদের দেশ সফরকালে।

আরো একটি উৎস আছে যার কথা আগেই উল্লেখ্য করা উচিত ছিল। পবিত্র কুরআনে তার উল্লেখ রয়েছে। সূরা আল-আন'আমে উল্লেখ রয়েছে, একব্যক্তি পঁচিশ জন নবীর দীর্ঘ তালিকা পায়। এই তালিকার পর নিম্নবর্ণিত আয়াত নাযিল হয়। 'এরা তারাই যাদের আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তাদের দিকনিশানা অনুসরণ করো'। (৬-৯০)। ঐতিহাসিক মতামত থেকে প্রতীয়মান হয় যে কুরআনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে এ কথাই প্রতিফলিত হয়েছে যে আদম আ. ও নবীদের আ. যে আদেশ যা হযরত মুহাম্মদ স. পর্যন্ত, তাঁর (আদম) পরবর্তী সময়ে দেয়া হয়েছে, তা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাদেরকে এক নবী এবং অন্য নবীর মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে মানা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে যে কোন নবীর কাছে পাঠানো আইনসমূহকে, মুহাম্মদের স. কাছে পাঠানো আইন বা বিধানের সমপর্যায়ের মর্যাদা দেবার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এই সমস্ত বিধিবিধান আল্লাহ'র বিধি-বিধান। কুরআনে বলা হয়েছে- 'দূত তাই বিশ্বাস করেন যা তার প্রভুর নিকট থেকে নাযিল হয়েছে এবং বিশ্বাসীরাও তাই করে : তাদের সকলেই আল্লাহ'য় ও তার ফেরেশ্‌তাদের ওপর বিশ্বাসী এবং তার কিতাবসমূহ ও তার দূতদের ওপর।' বলা হয়েছে, 'আমরা তার দূতদের কারো মধ্যেই প্রভেদ রচনা করি না' এবং তারা বলেন, 'আমরা শুনি এবং আমরা মান্যও করি'। (২:২৮৫)

আল্লাহ আইন দানকারী। যদি তিনি আদম ও মূসাকে কিছু আইন দিতে পারেন, একমাত্র তিনিই তা সংশোধন বা পরিবর্তন করতে পারেন। অন্য কথায়, আল্লাহ যদি মহানবীর স. অগ্রবর্তী নবীদের কারো কারো ওপর দেয়া বিশেষ কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী পালন না করার জন্য তাঁকে (মহানবীকে) স. আদেশ দিতেন, তাহলে পুরনো আইন বাতিল ও নতুন আইন বাধ্যতামূলক হতো। আগের নবীদের স. অনুসরণ করতে হতো। এটা এই শর্ত সাপেক্ষ যে আমরা আগেকার নবীদের স. আমলে পাওয়া আইনের প্রমাণিত জ্ঞানের অধিকারী হয়েছি। আমরা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত উদারহণ দেখেছি, যেখানে মূসা বা ইবরাহীমের আমলে একটি নির্দিষ্ট আইন বিরাজমান ছিল কিন্তু কুরআন ইহুদী ও খৃষ্টানদের তাদের ধর্মগ্রন্থে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। অবশ্য যেহেতু মূসা ও যীশু খ্রীষ্টের আইন নির্ভরযোগ্য উৎসের মাধ্যমে সরাসরি আমাদের কাছে পৌঁছেনি, সেহেতু নির্দিষ্ট কোন আদেশ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেগুলো সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে পারি না।

বস্তুত আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে, ইতিমধ্যেই আমলে নেয়া ইসলামী আইনের উৎসের সাথে পূর্বেকার নবীদের আইন অন্তর্ভুক্ত করা। একটি উদাহরণ বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে। কুরআনের সূরা আল- নূরে ব্যভিচারের জন্য এক শ' বেত্রাঘাতের বিধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহানবীর স. নৈতিক শিক্ষা এবং অনুশীলনীর ভিত্তিতে বিবাহিত লোকদের মধ্যে ব্যভিচারের ঘটনার প্রেক্ষিতে পাথর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। এই শাস্তির ভিত্তি কি যার উল্লেখ এমনকি কুরআনেও নেই?

এ ক্ষেত্রে বহু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে যে কুরআন শুধু এক শ' বেত্রাঘাতের বিধান দিয়েছে- পাথর মেরে হত্যার বিধান দেয় নি। কিন্তু এটা সেরূপ নয়।

একটি সামগ্রিক যাচাইয়ে এটা জানা যাবে যে, কুরআন পূর্ববর্তী নবীদের বিধিবিধানের অনুসরণে কাজ করতে বলেছে। পাথর মেরে হত্যাকে তাওরাত ও ইঞ্জিল উভয় কিতাবেই অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এমনকি বর্তমান কালেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্মগ্রন্থের যে সংস্করণ প্রচলিত তাতেও এই আদেশ বিধৃত রয়েছে। আমাদের নবী স. এ ধরনের বিধান যে বিরাজমান তাও দেখতে পেয়েছেন। কুরআন যদি এই বিধানের উল্লেখ না করতো তাহলে এর অর্থ দাঁড়াতো যে এটা বাতিল করা হয় নি। এর বিপক্ষে স্পষ্ট নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে পুরনো বিধান বলবত থাকে এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে এটা আমাদের বিধানে পরিণত হয়। এটা আমাদের দ্বারা তৈরি হয় নি। বিধানটি আল্লাহ্ কর্তৃক সৃষ্ট এবং এটা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। তাওরাতে একথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যভিচারের ক্ষেত্রে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। অবশ্য অবিবাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যভিচার হলে দোষী ব্যক্তিদের শুধু জরিমানা দিতে হবে।

কুরআন এই বিধান বাতিল করেছে। শুধুমাত্র জরিমানা আরোপ লাম্পট্যকে উৎসাহিত করবে। অধিকতর কার্যকর শাস্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন ছিল। সুতরাং, একশত বেত্রাঘাতের বিধান দেয়া হয়। আমরা যখন দেখতে পাই যে, পবিত্র কুরআন তার নীরবতার মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিধানের একটি অংশ বজায় রেখেছে এবং স্পষ্টভাবে অন্য অংশ বাতিল করেছে উভয় ক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা বিধিবিধানের মর্যাদা অর্জন করে। এই বিবৃতির দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ পায় যে, শরীয়াহ্ বা আগের নবীদের বিধিবিধান, বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌছানো এবং কুরআন কর্তৃক সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল না হওয়া সাপেক্ষে আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

যুক্তির ব্যবহার

এখন আমরা ইসলামী আইন উন্নয়নের অন্য একটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো। এর অংশ বিশেষ আইনদাতা অর্থাৎ আল্লাহ এবং মহানবী স. কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। মানুষ কর্তৃক এ ধরনের আইন প্রণয়নের প্রশ্নই আসে না। কতগুলো বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নীরবতার ক্ষেত্রে মু'আয ইবনে জাবালের অনুসৃত নীতি থেকে যেমনটি দেখা যায়, আমরাও নিজস্ব যুক্তি ব্যবহার করে একটি যথাযথ আইন প্রয়োগের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে পারি।

এ ধরনের একটি কাজ শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই হাতে নেয়া সম্ভব। একজন চিকিৎসক অথবা একজন বেকার (রুটি-বিস্কুট প্রস্তুতকারী) আইন প্রণয়ন সম্পর্কে যাদের কিছুই করার নেই, তারা এ ক্ষেত্রে বেশি কিছু অবদান রাখতে পারবে না। মুসলিম সমাজে এক ধরনের লোক আছে যারা আইন প্রয়োগ করে এবং কিছু লোক আছে যারা এর ব্যাখ্যা দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধে একজন বিচারক আইন প্রয়োগ করে কিন্তু একজন মুফতি শুধুমাত্র বিষয়টির ব্যাখ্যা দেয়, আইন প্রয়োগ করে না। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়েই আইন প্রণেতার সহায়ক কর্তব্য পালন করে। কুরআন ও হাদীস মৌলিক আইন প্রদান করে। এ দুয়ের নীরবতার ক্ষেত্রে এ সকল লোক তাদের নিজস্ব যুক্তি প্রয়োগ করে এবং আইনের ব্যাখ্যা ও তার প্রচলন করে।

একটি উদাহরণ বিবেচনায় আনা যাক। কুরআন চুরি করার শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় চুরি করে, যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারে না, বিচারক এটিকে চুরি হিসেবে

বিবেচনা করে না। তাহলে এই চুরির জন্য কি শাস্তি তার প্রাপ্য নয়? এটা কি সাধারণ চুরির আওতায় আসে, না কি এর জন্য অন্য একটি আইনের প্রয়োজন? যেহেতু কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধের ধরন নির্ধারিত নেই সেহেতু অনুমান এবং কারো নিজস্ব যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি আইন তৈরি করা ছাড়া কোন পথ নেই। এ ধরনের কোন ক্ষেত্রে, আমাদের বিচারকগণ একটি আইন অনুমান করার চেষ্টা করেন। আমরা এই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব করছি না। আমরা শুধু এমন একটি পরিস্থিতির উদাহরণ উপস্থাপন করতে চাইবো, যাতে আমাদের জুরিষ্ট, মুফতি ও বিচারকবৃন্দ কর্তৃক একটি আইন উদ্ভাবন ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে যা এর উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

চুরি সম্পর্কে একটি আইন রয়েছে কিন্তু কাফনের কাপড় চুরি সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এই আইন আমাদের মুফতি ও বিচারক কর্তৃক অনুমিত। এই অনুমান আমাদের আইনের অংশে পরিণত হয় এবং এর উন্নয়নে অবদান রাখে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয় মহানবীর স. আমল থেকে। একটি রীতি-নীতির মধ্যে একটি ব্যাখ্যায় আমরা উপনীত হই। এটা বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী স. জনগণকে বলেছেন, যদি তাদের কোন কিছু সম্পর্কে জানতে ইচ্ছা হয় তাহলে তারা যেন আবু বকরের কাছে জিজ্ঞেস করে, যিনি আইনের ওপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিলেন। সাহাবাবৃন্দ প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত জানার জন্য মহানবীকে স. উত্যক্ত না করে আবু বকরের কাছে যেতে লাগলেন। ছোট খাটো বিষয়ের ওপর বলার জন্য তার রসূলের স. অনুমতি ছিল। প্রধান কোন সমস্যার ক্ষেত্রে অবশ্য নিজস্ব রায় দেবার আগে তিনি (আবু বকর) রসূলের স. সঙ্গে আলোচনা করে নিতেন। যে সব ক্ষেত্রে নবী স. ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছেন, আবুবকর শুধুমাত্র তার অস্তিত্বের কথা সাহাবাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং তার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতেন।

এভাবে বিচারকের রায় প্রদান শুরু হয় নবীর স. আমলে। কত সংখ্যক লোক (মুফতি) বিচারকের রায় দিতেন তা আমরা জানি না। তবে ঐতিহাসিকভাবে আবু বকরের নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। মহানবীর স. মুফতি হিসেবে তাঁকে মনোনিত করা হয়। হতে পারে আরো কিছু লোককে এই কর্তব্যের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মুসলিম কমনওয়েলথের সম্প্রসারণের সাথে সাথে স্বাভাবিক ভাবে বিচারকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল, বিশেষ করে ইয়েমেনে, যা ছিল একটি বিরাট প্রদেশ এবং সেই আমলে এটা (এই প্রদেশ) ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত উন্নত।

ইয়েমেনের মানুষ যাযাবর ছিল না বরং তারা বসতিতে বসবাস করতো এবং কৃষি কাজ ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপৃত ছিল। একাধিক কর্মকর্তা বিচার কাজে নিয়োজিত ছিল। একজন গভর্ণর ছিলেন যাকে অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারী সহায়তা দিতো। ইতিপূর্বে মু'আয ইবনে জাবালের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তিনি একাধারে গভর্ণর ও বিচারক ছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে তিনি শিক্ষার (বিভাগের) মহাপরিদর্শকও ছিলেন। আল-তাকারিতে বলা হয়েছে যে তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল বিভিন্ন গ্রাম সফর করা এবং শিক্ষা দান করা। খুব সম্ভব, তিনি বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করতেন (সে যুগে এবং সে পরিবেশে যে রকম বিদ্যালয় কায়েম সম্ভবপর ছিল) এবং জনগণকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। তিনি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং তার কর্তব্য ছিল নির্দেশ দেয়া।

ইয়েমেনে পাঠানো অন্যতম বিচারক হচ্ছেন আবু মুসা আল-আশআ'রী। বিশেষভাবে তার নাম উল্লেখ করা হলো এ জন্য যে তার নিয়োগপত্র ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে। আমরা দেখেছি যে, প্রশাসনের নীতিতে একটি

সরকারী পরিচয় পত্র প্রয়োজন। এতে এই মর্মে বর্ণিত থাকে যে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট অফিসের দায়িত্ব দেয়া হলো এবং সংশ্লিষ্ট জনগণ তাকে রসূলের স. প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করবে। এইরূপে নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে অমান্য করা হলে তা নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষকে অমান্য করার শামিল হবে। বিচারকদের দেয়া নিয়োগপত্রে তাদের দায়িত্বেরও উল্লেখ থাকতো। এই প্রক্রিয়াও নবীর স. আমল থেকেই শুরু এবং আমর ইবনে হাযমকে দেয়া নির্দেশনা এখনও সংরক্ষিত রয়েছে।

আমরা ইতিমধ্যেই প্রাথমিক উৎসের উল্লেখ করেছি যার মধ্য দিয়ে রসূলের স. আমলে ইসলামী আইনের উন্নয়ন হয়েছে। দু'টি নতুন উপাদান মুফতি ও কাজী এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কাজী বা জজদের জন্য স্বভাবতই আইনের প্রয়োজন হতো। তাদেরকে উদ্ভুত পরিস্থিতি ও অবস্থা স্মরণে রেখে প্রতিটি মোকদ্দমায় সিদ্ধান্ত নিতে হতো। বেশ কিছু নজির রয়েছে যখন একজন গভর্ণর বা বিচারক, বিষয়টি নবীকে স. রেফার করতেন এবং তাঁর উপদেশ কামনা করতেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে গভর্ণর বা বিচারক তাদের নিজস্ব ক্ষমতা ব্যবহার করে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতেন। কোন ক্ষেত্রে যদি নবী স. কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদন না করতেন, তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নির্দেশ দিতেন। এখানে একটি উদারহণ তুলে ধরা হলো। এই মর্মে একটি পুরনো আরব রীতিও ছিল যে একজন নিহত ব্যক্তির রক্তপনের অর্থ নিহত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে অর্থাৎ পুত্র, পিতা, ভাইপো বা ভাগ্নে প্রভৃতিকে দেয়া হতো। নিহত ব্যক্তির বিধবা পত্নী এর কোন অংশের প্রাপক ছিল না। নবী স. যখন এ ধরনের একটি বিচারিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জ্ঞাত হলেন, তখন তিনি ইয়েমেনের তদানিন্তন গভর্ণর দাহ্হাককে বিচারিক সিদ্ধান্তের কথা লিখে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে নিহতের বিধবা পত্নীকে সেই হারে রক্তের অর্থ প্রদান করা হোক যে হারে নিহত স্বামীর সম্পত্তির অংশ সে পেয়ে থাকে। কুরআনে এ সম্পর্কে কোন রায় নেই এবং এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত হাদীসেও এর উল্লেখ ছিল না। সুতরাং, এটা ছিল একটি নতুন আইন যা নবী স. প্রবর্তন করেন।

আমরা ইতিমধ্যেই রসূলের স. জামানার আইনের দুটি স্থায়ী উৎসের কথা উল্লেখ করেছি। এগুলো হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। পরবর্তীকালে আরো দু'টি উৎস সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। আইনী সমস্যা সমাধানের জন্য মুসলমানরা প্রথমেই কুরআন এবং হাদীসের উল্লেখ করে থাকে। এ দু'টির কোনটিতেই যখন সমাধান পাওয়া না যায় সে ক্ষেত্রে তারা ইজতিহাদ বা নিজস্ব যুক্তি বা বিচারবুদ্ধির স্মরণাপন্ন হয় যে পন্থার কথা রসূল স. নিজেই বলে গেছেন।

মুসলিম সমাজের কাছে এই নীতি অত্যন্ত মূল্যবান। এর অভাবে ইসলামী আইন গতিশূন্য হয়ে পড়তো; এবং তাদের নিজস্ব আইন অপর্যাপ্ত হয়ে দেখা দিতো। ফলে মুসলমানরা অনৈসলামিক আইন গ্রহণে বাধ্য হতো। কিন্তু বিচারবুদ্ধি ও ইজতিহাদ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তারা প্রতিটি নতুন বিষয়ের মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

ওমর রা. কর্তৃক তার বিচারকদের প্রতি দেয়া এক নির্দেশনা পাওয়া গেছে। তিনি স্বেচ্ছাচারি রায় প্রদান এবং তা ত্বরিত বাস্তবায়ন না করে সুচিন্তিতভাবে রায় দিতে বলেন। সেই বিষয়ে বিচারকরা যদি আইন অবগত না থাকে তাহলে সমস্যাটির বিষয় নিয়ে নিজে গভীর চিন্তা করতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের এলাকার পন্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলা হয়। এটা সামষ্টিক ইজতিহাদ হতে পারে। এটা খলিফারাও অনুশীলন

বা চর্চা করতেন। অসংখ্য নজীর রয়েছে যেখানে আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী যে সমস্ত বিষয়ের ওপর কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না পাওয়া যেতো সে সকল জটিল বিষয় নিষ্পত্তিতে আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

এ ধরনের বিষয়ের জন্য মসজিদে সাধারণ সভা ডাকা হতো। খলিফা জনগণের সামনে প্রশ্নটি উপস্থাপন করতেন এবং তাদের মতামত নিতেন। প্রতিটি লোকের মতামত প্রকাশের অধিকার ছিল। বড়, ছোট কিংবা নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আলোচনায় অংশ নিতে পারতো। আমরা নারীদের কথা উল্লেখ করলাম এই জন্য যে আমরা ওমরের শাসনামলের একটি ঘটনা জানতে পারি। একটি মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে পিতা-মাতা বড় অঙ্কের অর্থ দাবি করে। সম্ভাব্য জামাতা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের দাবিতে আটকা পড়ে। ওমরের গোচরে আসে যে এই ঘৃণ্য সামাজিক দুস্কৃতি মেয়েকে বিয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে।

সুতরাং ওমর বধুকে দেবার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ (মোহর) নির্ধারণের নির্দেশ দেন। রসূলের স. সাহাবাদের কারো তরফ থেকেই কোন রকম আপত্তি উত্থাপিত হয় নি। কিন্তু একদিন এক বৃদ্ধ মহিলা মসজিদে উপস্থিত হয়ে এ ধরনের আদেশ জারি করার ওমরের অধিকার চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তিনি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তুলে ধরলেন যাতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাকো তবুও তা থেকে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা তা গ্রহণ করবে। (৪:২০) তিনি যুক্তি দেখালেন, আল্লাহ যদি একজন পুরুষ কর্তৃক একজন মহিলাকে অর্থ উপহার দেয়ার অনুমতি দেন, তাহলে ওমরের সেই বিষয়ের আইন বা তার স্থলে অন্য আদেশ দেবার এখতিয়ার নেই। ওমর অবিলম্বে স্বীকার করেন যে মহিলাটি সঠিক বলেছে এবং তিনি তার আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।

এতে বোঝা যায় যে, সাধারণ সভায় যে কোনো লোক যে কোনো বিষয় উত্থাপন করতে পারতো। পন্ডিত অথবা অশিক্ষিত, যুবক অথবা বৃদ্ধ, পুরুষ অথবা মহিলার সমান অধিকার ছিল। কাউকে বৈষম্যের শিকার হতে হয় নি। প্রত্যেকে তার মতামত ব্যক্ত করতো আর সর্বসম্মতভাবে সমর্থিত হলে গৃহীত হতো অথবা সমর্থিত না হলে তা পরিত্যক্ত হতো। যে কোনোভাবেই হোক না কেন খেলাফতের প্রাথমিক শাসনামলে আমরা সম্মিলিত আলোচনা এবং বিচারক ও মুফতিদের ব্যক্তিগত রায় দিতে দেখতে পাই। এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

প্রাথমিক যুগেই যেহেতু মুসলমানরা তিনটি মহাদেশ যথা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে সেহেতু তাদেরকে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি এবং অভ্যাসের বশবর্তী বহুসংখ্যক জাতির সংস্পর্শে আসতে হয়। অনেক নতুন পরিস্থিতি ও নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাদের। বিভিন্ন প্রকার আইনী মোকদ্দমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাদের, যার জন্য পূর্বেকার কোন নজীর পাওয়া যেতো না। ওসমানের শাসনামলে এক ইস্যু সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে অমুসলিম প্রজাদের ওপর জিজিয়া নামক কর আরোপের কথা বলা হয়েছে। একই প্রেক্ষিতে পূর্বেকার আসমানী কিতাবের অনুসারিদের কথাও বলা হয়েছে। ওসমানের খেলাফতের আমলে বারবার জাতি অধ্যুষিত উত্তর আফ্রিকা জয় করা হয়। তখন একটি প্রশ্ন দেখা দেয় বারবারদের ওপরও এই কর আরোপ করা হবে কি না। এর আগে, ওমরের আমলে ইরানের পার্সিদের সম্পর্কেও একই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। এর উত্তর সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ আবদুর রহমান

আওক এই মর্মে নবীর স. এক রীতির উদ্ধৃতি দেন যে পার্সিদেরকে কিতাবীদের সমতুল্য গণ্য করতে হবে, তবে তাদের মহিলাদের বিয়ে করা এবং তাদের দ্বারা জবাই করা পশুর গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না।
অবশ্য বারবারদের সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশনা নেই এবং রসূলের স. কোন নিষেধাজ্ঞার কোন নজীরও তুলে ধরা সম্ভব হয় নি। যথাযথ বিবেচনার পর খলিফা আদেশ দেন যে জিজিয়া আরোপ করা হোক। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী সময়ে সকল অমুসলমান প্রজাদের ওপর সম্প্রসারণ করা হয়। মুসলমানরা যখন সিন্ধুতে পৌঁছে, তারা এই ধারা অব্যাহত রাখে। তারা যখন আরো পূর্বে অগ্রসর হয়, তারা এই কর ব্রাহ্মণদের ওপর আরোপ করে। সংক্ষেপে ইমাম আবু ইউসুফের ভাষায়, সকল অমুসলমানের ওপর জিজিয়া আরোপ করা হয়-তা তারা অগ্নি, বৃক্ষ বা পাথর পূজারীই হোক না কেন। তাদের সকলকে একইভাবে দেখা হতো। প্রজাদের ওপর কুরআনের বিধি নিষেধ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হতো, সীমিত অর্থে নয়। ফলে ধারণা জন্মে যে, জিজিয়া কর কিতাবীদের মধ্যে সীমিত না রেখে অন্যদের মধ্যেও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

কুফার স্কুল

ওমরের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য আইনী উৎকর্ষের উন্মেষ ঘটে। তিনি একজন শিক্ষিত সাহাবা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে কুফায় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি না ইতিহাসবিদ, না একজন সূফী না খালিদ ইবনে ওয়ালিদের মতো একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে নিশ্চিতই একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কুফায় শিক্ষা দান করতেন। এটা অবশ্যম্ভাবি ছিল যে তার লেকচার আইন ও আইন বিজ্ঞানের রেফারেন্সে ভরপুর থাকতো। যখন তাঁকে কুফায় পাঠানো হয় তাঁর নিয়োগপত্রে লিখিত ছিল : 'হে কুফার মুসলমানবৃন্দ! আমি আপনাদের কাছে রসূলের স. একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন সাহাবাকে পাঠাচ্ছি। আপনারা প্রশংসা করবেন যে তার সাথে বিচ্ছেদ করে আমি আপনাদের জন্য একটি ত্যাগ স্বীকার করছি। এটা (এ পত্র) তার গুরুত্বের কিছুটা ধারণা দেবে।'
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আমৃত্যু আইন শিক্ষা দিয়ে গেছেন। কুফার বাসিন্দাদের মধ্যে তিনি একজন মেধাবী ইয়েমেনী ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর নাম আলকামাহ, যিনি তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র প্রমাণিত হয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মৃত্যুর পর, তিনি কুফার প্রধান মসজিদের আইনের অধ্যাপক হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন। তার মৃত্যুর পর আরেকজন ইয়েমেনী তার স্থলাভিষিক্ত হয়। তিনি ছিলেন কুফার বাসিন্দা এবং আলকামাহর ছাত্র। তাঁর নাম ছিল ইবরাহীম আল নখঈ। আইন বিজ্ঞান শিক্ষায় কুফা সুনাম অর্জন করেছিল।
ইবরাহীম আল-নখঈ-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র (একজন অনারব) হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও আইন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং আইন বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছাত্র আবু হানিফা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও ছিলেন অনারব। সে সময় তিনি ছিলেন খুবই তরুন কিন্তু হাম্মাদের ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রখর ধীশক্তির অধিকারী। তিনি এই পদ গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন কিন্তু তাঁর সহপাঠিরাই তাদের শিক্ষকের কর্তব্য গ্রহণে তাঁকে অনুরোধ করেন।
অত্যন্ত বুদ্ধিমান আবু হানিফা, মানুষের মনস্তত্ব বিষয়ে পরিপূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি আশংকা করেন এ ধরনের একটি উচ্চ পদে একজন তরুন যুবার নিয়োগ জনগণ মেনে নেবে না যতক্ষণ না তাদের বিশ্বাস করানো যায় যে তার লেকচারও গুরুত্বপূর্ণ হবে। সুতরাং আবু হানিফা তার সহপাঠিদের বললেন যে, তিনি

শিক্ষা দিতে সম্মত তবে শর্ত হলো তার সকল সহপাঠী কমপক্ষে এক বছর তাঁর লেকচারে উপস্থিত থাকবে। তারা তৎক্ষণাত এতে সম্মত হয়।

জনগণ যখন দেখলো যে তাঁর সহপাঠিরাও তার ছাত্র হলেন তখন তারা শিক্ষক হিসাবে তাঁর অনবদ্য সক্ষমতায় বিশ্বাস আনলো। অন্যান্য গুণাবলীর মধ্যে, আবু হানিফা সহমর্মিতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি সব সময়ই তার গরীব ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা দিতেন। তার সুনাম, প্রভাব ও কর্তৃত্ব ক্রমান্বয়ে জনগণের মাঝে বিস্তৃত হয়। তারা তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে থাকে। এটা ছিল উমাইয়া শাসনামলের শেষ দিক। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা ছিল খারাপ সময়। সন্ত্রাস ও সহিংসতা তখন ছিল সাধারণ ব্যাপার। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জনগণ তখন বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে। একটা বিপদসংকুল ও কঠিন সময় ছিল।

১২০ হিজরী সালের একটি ঘটনার কথা আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। হুসাইনের নাতি জায়েদ ইবনে আলী জয়নাল আবেদীন শাসককুলের স্বেচ্ছাচারে অতীষ্ট ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেন। আবু হানিফা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং যায়েদ উমাইয়া খলিফার স্থলাভিষিক্ত হন তিনি এটাই কামনা করেন। একদিন যায়েদ ইবনে আলী আবু হানিফাকে বললেন, তিনি জনগণের তরফ থেকে সাহায্যের নিশ্চয়তা পেয়েছেন এবং এই শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছেন। আবু হানিফা তাকে অর্থ দিতে চাইলেন বটে তবে তার সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিনি বললেন, তার অনুসারীরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সাথে বিশ্বস্ত থাকবে এ কথা নিশ্চিত হতে পারলে তিনি খুশী হতেন। তার আশংকা সঠিক ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যায়েদের অনুসারীরা তাকে পরিত্যাগ করেছিল। সরকার যায়েদকে গ্রেফতার করে হত্যা করেছিল। যায়েদ ইবনে আলী খুবই পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং বলা যেতে পারে যে আবু হানিফার দান দ্বারা তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। যায়েদ ইবনে আলী প্রণীত কিতাবের নাম ছিল আল মাজমু-ফি-আল-ফিকাহ। এটা একটা বিখ্যাত গ্রন্থ ছিল এবং এটাই এ বিষয়ের ওপর আমাদের কাছে প্রাপ্ত সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সেই সময় থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত ফিকাহ শাস্ত্রের কার্যাবলীতে যা দেখা যায় এই গ্রন্থের বিষয় ভিত্তিক সিকোয়েন্স একই রকম। এর শুরু হয়েছে কিতাব আল তাহারা (Taharah) শীর্ষক অধ্যায়ের মাধ্যমে যা অযু ও গোসলের মতো বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। এর পর এসেছে নামায, রোযা, ইবাদত, লেনদেন প্রভৃতি বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়গুলো। এই ক্রমবিন্যাসই আমরা দেখতে পেয়েছি যায়েদ বিন আলীর কার্যাবলীতে। আর এটাই এ যাবতকাল পর্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে অনুসৃত হয়ে আসছে।

আবু হানিফার অবদান

উমাইয়াদের স্থলাভিষিক্ত হয় আব্বাসীয়রা। জনগণ অধিকতর ভালোর কামনায় পরিবর্তন চেয়েছিল কিন্তু গভীর হতাশার অতলে তলিয়ে গেল তাদের আশা। এই সময়ে আবু হানিফা এমন এক সাফল্য গাথা সৃষ্টি করলেন যা আইন সংক্রান্ত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ফলাফল বয়ে আনে। মালিক ও আল-আওযায়ীর মতো বিশিষ্ট পন্ডিত ব্যক্তিবর্গ তখন জীবিত ছিলেন। তারা আইন কর্ম সৃষ্টি করেছিলেন তবে তা ছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। আবু হানিফা ইসলামী আইনের সার গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার

কথা চিন্তা করেন। তার অনেক ছাত্রের মধ্যে তিনি চল্লিশজন ছাত্রকে নির্বাচিত করেন যারা আইনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ছিল। তাদের নিয়ে তিনি একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। নির্বাচিত করার সময় তাদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যত্নবান হন যারা আইনের বাইরের বিষয়েও বিশেষজ্ঞ ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের পন্ডিতদের তিনি একাডেমিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ ক্ষেত্রে যে নিয়ম তিনি অনুসরণ করেন তা হচ্ছে, অনুমানসিদ্ধ প্রশ্ন তৈরি করা এবং সমস্যার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা।' আলোচনা কখনো কখনো মাসব্যাপী চলতো। অবশেষে যখন সর্বসম্মত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতো, একাডেমির সেক্রেটারি আবু ইউসুফ রায় নথিভুক্ত করতেন। এই সব কাগজপত্রের কিছু কিছু আমাদের কাছে এসেছে। তারা কোন সমস্যার ওপর আলোচনা নথিভুক্ত করতেন প্রশ্ন ও উত্তরের আকারে।

আবু হানিফার আমলে আইনের ওপর সারগ্রন্থ রচনার দু'টি প্রচেষ্টা নেয়া হয়ঃ একটি সরকার কর্তৃক এবং অন্যটি বেসরকারীভাবে খোদ আবু হানিফা কর্তৃক। সরকারী উদ্যোগ নেন খলিফা আল-মনসুর। ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি মালিককে ডেকে আনলেন এবং আইন বিজ্ঞানের ওপর তার বই সমাপ্ত করতে বললেন। কারণ তিনি সরকারী আইন হিসেবে এটাকে বাস্তবায়ন করতে চান। মালিকের অন্তরে ছিল প্রবল আল্লাহ ভীতি। তিনি এই অজুহাত দেখিয়ে বিনম্রভাবে তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন যে একজনের মতামত সবার ওপর আরোপ করা যেতে পারে না। জনগণের ভিন্নমত প্রকাশ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত। মালিক অস্বীকৃতি জানালে ইসলামী আইনের সারগ্রন্থ রচনা ঝুলে থাকলো। এই কর্তব্য পালন করেন আবু হানিফা। বছরের পর বছর ধরে কঠোর পরিশ্রমের পর এ কাজ সম্পাদন করে একটি সারগ্রন্থ তৈরি করেন তিনি। যে সম্পর্কে গভীর আস্থার সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, জাস্টিনিয়ান সারগ্রন্থের চেয়ে মানব জাতির চাহিদার অধিকতর পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সারগ্রন্থ এছাড়া আর দ্বিতীয়টি নেই।

সেই আমলে আরো পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন এবং তাদের ছাত্রও ছিল। সাহাবাদের মধ্যে পন্ডিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ। যার ছাত্রদের চতুর্থ প্রজন্মে ছিলেন আবু হানিফা। অন্য সাহাবা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর। যার ছাত্রের ছাত্র ছিলেন মালিক। তিনিই আইন বিজ্ঞানের মালিকী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তৃতীয় সাহাবা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যার কিছু কিছু আইনী মতামত লিখিত হয় খাওয়ারিজ (Khawarij) কর্তৃক। চতুর্থ সাহাবী ছিলেন আলী ইবনে আবু তালেব। তাঁর আইন সংক্রান্ত মতামত আমাদের কাছে পৌছে যায়েদ ইবনে আলী, 'ইসনা আশারিয়া এবং ফাতেমী ইমামদের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে আবু হানীফা ও মালিকের ছাত্র মুহাম্মদ-ইবন-অলি হাসানের ছাত্র শাফেয়ীর ছাত্রের ছাত্রের মাধ্যমে তা আমাদের কাছে পৌছে। আল শাফেয়ীর এক ছাত্র ছিলেন দাউদ আল যাহিরী। তিনি যাহিরী ফিকাহ ধারার প্রবর্তক। সংক্ষেপে বলা যায়, আইন সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলমানদের এই বিভিন্ন চিন্তা গ্রুপের মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য নেই। তারা একে অন্যের থেকে শিক্ষা নিয়েছেন এবং তাদের আইনগত মতামতের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

অনুবাদ ঃ নূরুল ইসলাম সরকার

তালাক একটি প্রয়োজনীয় বিধান

সাইয়েদ জালাল উদ্দীন উমরী

ইসলামী বিধি বিধানের উপর যে সব বড় বড় প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এর মধ্যে অন্যতম হল তালাক। বলা হয়ে থাকে পুরুষদেরকে তালাকের একচ্ছত্র অধিকার দিয়ে নারীদের উপর ইসলাম অবিচার করেছে। এটা একটা একতরফা ব্যবস্থা বৈ কিছু নয়। এতে নারীর জীবন পুরুষের মর্জির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সে যখন ইচ্ছা করবে সাধারণ ভুলভ্রান্তির কারণে অথবা কোন দোষ ত্রুটি ছাড়াই তালাক শব্দ উচ্চারণ করে স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। ফলে হঠাৎ করে একজন নারীর ভবিষ্যত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন ধারণে বাধ্য হয়।

তালাক যখন বিকল্পহীন প্রতিকার ব্যবস্থা

তালাকের যে ভয়ংকর রূপ দেখানো হয়েছে প্রথমত মুসলিম সমাজে এর অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত তালাক অনেক ঘরোয়া বিবাদ এবং বিশৃংখলার যথার্থ ও যুক্তিসংগত সমাধানও বটে। প্রকৃত বাস্তবতা হলো, অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর মিলেমিশে দাম্পত্য জীবন যাপন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। পরস্পর থেকে মুক্তিলাভের চিন্তায় উভয়েই মরিয়া হয়ে ওঠে। এর নানা কারণ হতে পারে। কখনো দুজনের স্বভাব এবং রুচির মিলন হয় না বিধায় একজন অরেকজনকে গ্রহণ করতে পারে না। কখনো বা দুজনের আর্থিক এবং সামাজিক বৈষম্য এত বেশী থাকে যা দূর করা খুবই দুঃসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কখনো দুজনের চিন্তা চেতনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, যদ্দরুন পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব অনুভব করে। কখনো কারো চারিত্রিক দুর্বলতা এত অধঃপতিত হয় যে, জীবনসঙ্গী এর সংশোধন থেকে নিরাশ হয়ে পড়ে এবং তাকে সহ্যই করতে পারে না। এসকল অবস্থায় মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং বিবেক উভয়ের বিচ্ছিন্নতাই দাবী করে। যদি খৃষ্টীয় ও হিন্দু সমাজের ন্যয় দাম্পত্য জীবনে তালাকের ব্যবস্থা না থাকতো এবং একত্রে বসবাসের জন্য উভয়কে বাধ্য করা হতো তাহলে বিবাহ বন্ধনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্জিত হতো না। বরং উভয়েই আরো মারাত্মক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হতো, যেমন-

এমতাবস্থায় প্রথমত স্ত্রী স্বামীর জন্য একটি বোঝা হয়ে যায় ফলে স্বামী তার সাথে জঘন্যতর আচরণ করে।

দ্বিতীয়ত তালাকের পর মহিলার মনমত পুরুষের সাথে বিবাহ হতে পারে এবং সুখময় জীবন লাভের সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে তালাকের পথ বন্ধ থাকলে এরূপ সম্ভাবনার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

তৃতীয়ত উভয়ের পারিবারিক জীবনে জাহান্নামের দুর্ভোগ নেমে আসে এবং মানসিক শান্তি নিশেষ হয়ে যায়।

চতুর্থত উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বিরোধের কারণে তারা সন্তানের প্রতি এতটুকু যত্নবান হতে পারে না যতটুকু যত্নবান হওয়া দরকার। ফলে সন্তানরা সঠিক প্রতিপালনের অভাবে ঝগড়াটে পিতামাতার ঝগড়াটে সন্তান হিসেবেই বেড়ে ওঠে।

** লেখক : একজন ভারতীয় আলেম ও আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।*

তালাকের অধিকার কার?

এখন এই প্রশ্নটা সামনে রাখা যেতে পারে যে তালাকের অধিকার কার?

এ প্রশ্নের তিনটি উত্তর হতে পারে। ১. তালাক দেয়ার অধিকার দুজনেরই সমান, ২. তালাক দেয়ার অধিকার পুরুষেরই থাকা উচিত, ৩. এ অধিকার মহিলার হাতেই অর্পণ করা উচিত।

প্রথম অবস্থা কার্যকর হলে অধিক হারে তালাক সংঘটিত হবে এবং পারিবারিক ভিত বিপন্ন হয়ে যাবে। কেননা যদি তালাক দেয়ার অধিকার নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোন একজনের হাতে থাকে তাহলে তুলনামূলক ভাবে এর প্রয়োগ কম হবে আর যদি এই অধিকার উভয়ের হাতে সমান ভাবে থাকে, প্রত্যেকেই স্বাধীন ইচ্ছায় এর প্রয়োগ করতে থাকে, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তা বৃদ্ধি পাবে। সত্যিকার অর্থে যে সমাজে তালাকের প্রয়োগ কম হয় সেই সমাজের খান্দানী ভিত শক্ত হয়। পক্ষান্তরে যেখানে এর আধিক্য থাকে সেই সমাজের খান্দানগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজে এ অধিকার উভয়কে দেয়ার ফলে বিবাহ এক তামাশায় পরিণত হয়েছে। স্বামী বা স্ত্রী যার যখন খুশি এই সম্পর্ককে ভেঙ্গে দিয়ে যে যার পথ ধরছে। পশ্চিমা সমাজে তালাকের আধিক্যের কারণে খান্দানগুলো ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।

ইসলাম দ্বিতীয় অবস্থাকে গ্রহণ করেছে। ইসলাম পুরুষকে তালাকের অধিকার দিয়েছে। এর কারণ এই যে, খান্দানের মধ্যে পুরুষের ভূমিকা বেশী। পুরুষই খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা এবং রক্ষক। স্বামী স্ত্রীর আর্থিক দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে সন্তানের লালন পালন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করে। এ জন্য সেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, স্ত্রীর সাথে মিলেমিশে এই দায়িত্বগুলো উত্তমরূপে সম্পাদন করবে। কুরআনের ভাষায়, স্বামীর হাতেই 'উকাদাতুন নিকাহ' (বৈবাহিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অথবা বন্ধন ছিন্ন করা) বিবৃত হয়েছে। যাকে তার পছন্দ হবে না অথবা তার কাজে যে স্ত্রীর সাহায্য পাবে না তাকে নিজের ঘরের মালিক করে রাখার উপর তাকে বাধ্য করা জুলুম বৈ কিছুই নয়।

তালাকের অধিকার পুরুষের হাতে থাকলে সে এর অপব্যবহার করবে একথা যুক্তিসংগত নয়। কারণ তালাক প্রদানে স্বামী বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্ত্রীকে সে যা মোহর দিয়েছে তা সে ফেরত চাইতে পারে না। বিয়ের সময় অথবা বিবাহ উত্তর মোহর পরিশোধ না করে থাকলে তালাকের সময় তা পরিশোধ করতে হয়। বিয়ের সময় প্রদত্ত কাপড় চোপড়, ও অলংকারাদি থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যায়। স্ত্রী সব কিছু নিয়ে যায়। ইতিমধ্যে স্ত্রীর পিছনে স্বামী যা কিছু ব্যয় করেছে তাও সে ফেরত পাবে না। তালাক দেয়ার পর পুরুষ যদি পুনরায় বিয়ে করতে চায় তাহলেও নতুন করে মোহর নির্ধারণ করতে হবে। বিয়ের পূর্ণ ব্যয় ভার পুরুষকেই বহন করতে হবে। এবং জীবন যাপনের অন্যান্য ব্যয় ভারও তাকেই দিতে হবে। উপরন্তু প্রথম স্ত্রীর কোন সন্তান থাকলে এদের লালন পালনের যাবতীয় খরচও তাকেই বহন করতে হবে। যারা পুরুষের হাতে তালাকের অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে তারা যেনো কল্পনার জগতে বাস করে। মানব জীবনের প্রকৃত সমস্যা নিয়ে ভাববার সময় তাদের নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি এ সকল সমস্যার সম্মুখিন হয় সে অবশ্যই এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য আরেক জন স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের সংসার প্রতিষ্ঠার পূর্বে একবার নয় হাজার বার চিন্তা করবে। একটি সংসার ভেঙে ফেলার পর পুন: প্রতিষ্ঠা করা চাট্টিখানি কথা নয়।

এবার তৃতীয় দিকটা নিয়ে ভাবা যাক। তৃতীয় দিকটা হলো তালাকের অধিকার মহিলাদের প্রদান করা। এতে তালাকের অপব্যবহার বন্ধ হবে না। পুরুষ তালাকের অধিকার পেয়ে অবৈধ পন্থায় তা ব্যবহারের মাধ্যমে

স্ত্রীকে কষ্ট দিতে পারে বটে পক্ষান্তরে এ অধিকার একচ্ছত্র ভাবে মহিলারা পেলে এর অপপ্রয়োগ করে পুরুষকে বেশী মুসিবতে ফেলবে।

এ অধিকার মহিলাদের হাতে দিলে যে সব অনর্থ ঘটতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সহ যাবতীয় দায় দায়িত্ব থাকবে স্বামীর উপর অথচ তালাকের অধিকার থাকবে স্ত্রীর উপর এটা হবে স্বামীর উপর জুলুম এবং অবিচার।

২. দ্বিতীয়ত তালাকের মধ্যে পুরুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নারীদের বাহ্যিক কোন ক্ষতি নেই। যদি তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে থাকে তাহলে কোন দুঃচরিত্রা স্ত্রী যখন ইচ্ছা করবে স্বামীকে তালাক দিয়ে বাচ্চাদেরকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মোহর এবং অলংকারাদি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। এবং নুতন মোহর, কাপড় চোপড় এবং অলংকারাদি নিয়ে অন্য পুরুষকে বিয়ে করে নেবে।

৩. তৃতীয়ত বাস্তবে পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশী আবেগ প্রবণ হয়ে থাকে। তাই তারা সাময়িক আবেগের বশবর্তী হয়ে পুরুষ থেকে আলাদা হয়ে যেতে প্রয়োহিত হবে এতে অধিক হারে তালাক সংঘটিত হতে থাকবে ফলে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেবে।

আদালতের মাধ্যমে তালাক সংঘটিত হওয়ার কুফল

উপরের আলোচনায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় আদালতের মাধ্যমে তালাক হলে এ সবের নিরসন হবে বলে মনে করা হয়। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে পরস্পর থেকে পৃথক হতে চায় সে আদালতে দরখাস্ত করবে। যে সকল কারণে পৃথক হতে চায় এগুলোর ব্যাপারে আদালত নিশ্চিত হবে এবং সমীচীন মনে করলে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিবে। অন্যথায় দরখাস্ত খারিজ করে দেবে।

এর মধ্যেও কিছু কুফল রয়েছে, তা হলো স্বামী-স্ত্রীর যেই তালাক লাভ করতে চাইবে সে আদালতকে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিপক্ষের ত্রুটি বিচ্যুতি কিছুটা বাড়িয়ে বলেই ক্ষান্ত হবে না বরং অনেক কঠিন থেকে কঠিনতর অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করবে। অপরপক্ষ নিশ্চিতভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করার সাথে সাথে পাল্টা অভিযোগ পেশ করবে। এতে উভয়ের চারিত্রিক অধপতন এমনভাবে ঘটবে যে সমাজে তাদের মূল্য একেবারেই কমে যাবে। এমনকি গোটা খান্দানই সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত হবে। এবং তারা মানুষের কাছে হাসির পাত্র হয়ে পড়বে।

আর বর্তমানে নিম্ন আদালতের অবস্থা তো সর্বজন বিদিত। সেখান থেকে সঠিক ও ন্যায্য কোন রায় বের করা খুবই কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। প্রশ্ন হলো, এই এই অন্তবর্তী কালীন সময়ে এরা কিভাবে এক সংগে জীবন যাপন করবে? আর কিভাবেই বা একজন আরেকজনকে সহ্য করবে?

দ্বিতীয় আরেকটা প্রশ্ন হলো, যদি আদালত উভয়কে আলাদা করার পক্ষে রায় না দেয় তাহলে প্রত্যেককেই নিরুপায় হয়ে একে অন্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে এবং বাধ্য হয়ে ঘর সংসার করতে হবে। এতে উভয়ের জীবন সংকীর্ণ হয়ে পড়বে।

কতিপয় চারিত্রিক উপদেশ

ইসলাম মানুষের সুন্দর সুশৃংখল মেজাজ আর মন মানসিকতা যে ভাবে গঠন করে এবং নৈতিকতাবোধকে যেভাবে লালন করতে শেখায় তাতে তালাকের মত ঘটনা খুবই কম সংঘটিত হবে। জৈবিক চাহিদা বিঘ্নিত

হলে অথবা ছোটখাট কোন ব্যক্তি স্বার্থের কারণে তালাক প্রদানের বিষয়টা শুধুমাত্র সম্ভাবনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তালাকের মতো এমন ধারালো তরবারি যখন তখন ব্যবহৃত হবে না। ইসলাম এ বিষয়ে যে সব দিক নির্দেশনা দিয়েছে নিম্নে তার কিঞ্চিত আলোচনা করা হলো।

বিবাহ একটি মূল্যবান চুক্তি

ইসলামে বিয়ের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রী শুধুমাত্র অল্প কিছুদিনের আরাম-আয়েশ এবং মেলামেশাই করে না বরং সারা জীবনের বন্ধুত্বে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ চুক্তিকেই কুরআনে মিছাকে গালীয, (কঠিন অঙ্গিকার) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (সূরা নিসা- ২১ নং আয়াত)

যে ব্যক্তি গুরুত্বের সাথে এহেন অঙ্গিকারে আবদ্ধ হয় সে সহজেই এটাকে লংঘন করার সাহস পাবে না। এটাকে খেলা তামাশা শুধু সেই মনে করতে পারে যে এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে না এবং অজ্ঞতাবশত এমন অঙ্গিকার করে বসেছে। রসূল স. বিবাহ এবং তালাকের ব্যাপারে ঠাট্টা এবং তামাশাকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন। কেননা হাসি মজাক কোন বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবনের পরিপন্থি, যা বিবাহে এবং তালাকের বেলায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেছেন, রসূল আকরাম স. ইরশাদ করেন 'তিনটি বিষয় এমন গুরুত্বপূর্ণ যে এতে ঠাট্টা বিদ্রুপও গুরুত্বপূর্ণ বিবাহ, তালাক এবং রুজআত।'[১]

ইমাম খাত্তাবী বলেন, সকল উলামায়ে কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, যদি কোন বুদ্ধিমান প্রাপ্ত বয়স্ক লোক স্পষ্ট ভাষায় তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তালাক সম্পন্ন হয়ে যাবে। যদি কেউ তা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেয় এবং এতে কিছুই হয় না বলে, তার কথা গ্রহণ যোগ্য হবে না। কোন কোন উলামা এ ধরনের বিষয়কে আল্লাহ তাআলার আয়াতের সাথে বিদ্রুপের নামান্তর বলে মন্তব্য করেছেন। এর কারণ হলো, এ ধরনের বিষয়কে যদি বৈধ করা হয় তাহলে আশংকা আছে, যে কেউ বিয়ে করা, তালাক দেয়া, অনুরূপ ভাবে দাস মুক্তি করার পর নিজের পদক্ষেপ এই বলে প্রত্যাহার করতে পারবে যে, আমি ঠাট্টা করছিলাম। এতে করে আল্লাহর বিধানের উপর আমল করার অবকাশ থাকবে না। এ জন্য হাদীসে যে সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে এ সম্পর্কে মুখে কোন বিষয় সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এর উপর আমল করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।[২]

তালাক অত্যন্ত অপছন্দীয় কাজ

প্রয়োজনের সময় ইসলাম তালাক প্রদানের অনুমতি দিয়েছে মাত্র। কিন্তু সংগে সংগে এ কথাও বলে দিয়েছে যে, এটা কোন উত্তম কাজ নয়। বরং আল্লাহর নিকট তা খুবই অপছন্দনীয় পদক্ষেপ। একান্ত অপারগ এবং নিরুপায় হলেই শুধু এ পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী রসূল করীম স. এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তাআলার নিকট বৈধ জিনিসের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো তালাক দেয়া।[৩]

হযরত মুহারেব ইবনে দেছার নবী করীমের স. এরশাদ উদ্ধৃত করে বলেন, আল্লাহ তাআলা তালাক অপেক্ষা গর্হিত এবং অপছন্দনীয় কোন জিনিসকে হালাল করেননি।[৪]

এ বিষয়ে অপর একটা রেওয়ায়েত হযরত মুআয থেকে বর্ণিত আছে। যদিও তা সনদের দিক থেকে দুর্বল কিন্তু উপরের বর্ণনাকে সহায়তা দান করে। রসূল স. বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা জমিনের বুকে দাস মুক্তির চাইতে পছন্দনীয় কোন বস্তু সৃষ্টি করেনি এবং তালাকের চেয়ে গর্হিত কোন কিছু জমিনের বুকে সৃষ্টি করেননি।[৫]

একদিক থেকে ইসলাম পুরুষের মাথায় একথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, তালাক অপছন্দনীয় কাজ- অপর দিকে মহিলাদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে যে, বিনা কারণে পারতপক্ষে যেন স্বামীর কাছে তালাক কামনা না করে। হযরত ছাওবান রা. থেকে, বর্ণিত আছে, রসূল স. এরশাদ করেছেন, 'যে মহিলা কোনরূপ অপারগতা ছাড়া স্বামীর নিকট তালাক প্রার্থনা করে জান্নাতের গন্ধও তার জন্য হারাম।'[৬]

মহিলাদের দুর্বলতা সহ্য করা উচিত

সামগ্রিক জীবন কোন ব্যক্তির একক চাহিদা পূরণের অধীন নয়। এবং সামগ্রিক জীবনের উপকারিতা লাভের জন্য ব্যক্তিগত মতামত ও চাহিদা কুরবান করতে হয়। অনুরূপ ভাবে পারিবারিক জীবনেও এমন সব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে যেখানে স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের মতামত এবং চাহিদার মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। যদি দুজনের মধ্যে কারো কোন বিষয় অপরজনের পছন্দ না হয় তাহলে এর সমাধান এই নয় যে, চটজলদি তালাক দিয়ে এই পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া। অনেক সময় মানুষের মধ্যে আবেগ ও কামনা-বাসনার প্রাবল্য দেখা দেয়। তখন সে শুধুমাত্র নিজের নগদ স্বার্থ সিদ্ধির মধ্যেই নিজের মঙ্গল দেখে। বৃহত্তর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ তার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। ইসলামের শিক্ষা হলো, খান্দানের দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাধারণ ভুল ভ্রান্তি সহ্য করা বাঞ্ছনীয়। মহব্বত এবং প্রীতি প্রণয়ের মধ্যে উত্তম আচরণ বজায় রাখা। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- 'এবং তাদের সাথে উত্তম ভাবে জীবন যাপন করো। যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর তাহলে এমনও হতে পারে কোন একটা বিষয় অপছন্দ হলেও আল্লাহ তাআলা এর মধ্যে অনেক কল্যাণ রেখে দিয়েছেন।' (সূরা নিসা ঃ ১৯)

সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত

স্ত্রী অবাধ্য, নাফরমান, অনুগত নয় তারপরও ইসলাম তাৎক্ষণিক তালাক দিতে নির্দেশ দেয়নি। বরং স্বামীকে বিশেষ অধিকার দিয়েছে সে কখনো কোমলভাবে, প্রয়োজনে কঠোরভাবে তার সংশোধনের চূড়ান্ত চেষ্টা করবে। ঘরের ঝগড়া যেনো ঘরের মধ্যেই সীমিত থাকে, তালাকের অবকাশ যেনো সৃষ্টি না হয়। ইরশাদ হচ্ছে- 'যে মহিলার ব্যাপারে তোমাদের অবাধ্যতার আশংকা হয় তোমরা তাদের ভাল করে উপদেশ দাও বুঝাও, তাদের বিছানা থেকে আলাদা হয়ে রাত্রি যাপন কর, (এতে সংশোধিত না হলে) প্রহার কর, এতে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয় তাহলে তাদের উপর বাড়াবাড়ি বা নিপীড়নের পথ অন্বেষন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের অপেক্ষা সমুন্নত এবং মহান।' (নিসা ঃ ৩৪)

তালাক প্রতিহত করতে স্ত্রী স্বীয় অধিকার বর্জন করতে পারে

একদিকে ইসলাম পুরুষকে তাগিদ দিয়েছে, সে যেন স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে, তার অধিকার আদায় করে। তার ভুলভ্রান্তি যেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে। তার সৎগুণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অপরদিকে স্ত্রীকে বলেছে সে যেন সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে স্বামীর কাছে তালাকের দাবী নিয়ে ধর্না না দেয়। যদি সে দেখে স্বামী তার সাথে অনৈতিক আচরণ করছে এক্ষেত্রে নিজের অধিকার আদায়ে পীড়াপীড়ির পরিবর্তে নিজের প্রাপ্য অধিকার ত্যাগ করার মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে প্রস্তুত থাকে। স্বামীর প্রতিপক্ষ হয়ে ঝগড়া বিবাদের পরিবর্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য চেষ্টা করে। যদি মহিলা তার প্রাপ্য অধিকারের কিছু অংশ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে পুরুষের জিম্মাদারী হালকা করে দেয় তাহলে স্বামীর এটাকে হেয় মনে করা উচিত নয়। স্ত্রী তাকে সহায়তা করবে আর স্বামী তার থেকে উপকৃত হবে এটা তার মর্যাদার পরিপন্থী নয়। আল্লাহ বলেন: 'কোন স্ত্রী যদি স্বামীর রূঢ় ব্যবহার এবং উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে পরস্পর মিলে যে আপোশ নিষ্পত্তি

করতে চাইলে কোন অপরাধ হবে না। এবং আপোশ নিষ্পত্তিই বরং উত্তম। মানুষের মন লোভের কারণে কৃপণতার দিকেই আকৃষ্ট হয়। তোমরা পরস্পরের প্রতি সদাচরণ কর এবং তাকাওয়া অবলম্বন কর, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত।' (সূরা নিসা-১২৮)

হাফেজ ইবনে কাছির বলেন, মহিলা যদি অনুভব করে যে স্বামীর মধ্যে তার প্রতি অনীহা ভাব এবং দূরত্ব বাড়ছে তাহলে সে ভরণ পোষণ, পোশাক পরিচ্ছদ, রাত্রি যাপনের যে সব অধিকার স্বামীর উপর রয়েছে তার পুরোপুরি কিংবা আংশিক ছেড়ে দিতে পারে। এতে যদি স্বামী আপোস করতে আগ্রহী হয় এতে কোন অপরাধ হবে না। স্ত্রী নিজের সম্পদ স্বামীর জন্য ব্যয় করতে পারে আর স্বামীও তা গ্রহণ করতে পারে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা অপেক্ষা আপোস নিষ্পত্তিই উত্তম।'[৭]

উভয় পক্ষের দায়িত্বশীলগণ আপোস নিষ্পত্তির চেষ্টা করবেন

কোন কোন সময় ছোট ছোট বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মত বিরোধ শুরু হয়। এবং তা ক্রমান্বয়ে বেড়ে গিয়ে তীব্র রূপ ধারণ করে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এক প্রকার দূরুত্ব এবং অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে যায়। এক পর্যায়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, নিজেদের ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আপোস করে নিতে ব্যর্থ হয়। কুরআন এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যেখানে পারস্পরিক মত বিরোধের নিজেরা মীমাংসা করতে পারেনা সেক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে একেক জন করে দায়িত্বশীল একত্রিত হয়ে আপোস মীমাংসার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাবে। তাদের মধ্যে ইখলাস এবং নেক নিয়্যত থাকলে আল্লাহ তাআলা তাদের সাহায্য করবেন। এবং সব জটিল বিষয়েও সমাধানের কোন পথ বের হয়ে যাবে।

ইরশাদ হচ্ছে, 'যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদের আশংকা হয় তাহলে স্বামীর পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন করে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করে নাও। তারা উভয়ে মিলে যদি সংশোধনের চেষ্টা করে তাহলে আল্লাহ তাআলা দম্পতির মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টি করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞাত এবং সম্যক অবগত।' সূরা নিসা ঃ ৩৫

তালাক সংক্রান্ত দুটো সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

উপরে উল্লেখিত চেষ্টা ব্যর্থ হলেই শুধু তালাক প্রদানের অবকাশ সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে ইসলাম নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে,

> ১. আরবদের মধ্যে তালাক প্রদান এবং তালাক প্রত্যাহারের (রুজু) কোন পরিসীমা ছিল না। যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে কষ্ট দিতে চাইত তখনই তালাক দিত এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রত্যাহার করে নিত। তারপর আবার তালাক দিত আবার প্রত্যাহার করে নিত।[৮] যতক্ষণ পর্যন্ত তার মন চাইতো এই ধারাবাহিকতা অব্যহত থাকত। ফলে সেই মহিলা বিবাহিত থাকা সত্ত্বেও তালাক প্রাপ্তা হিসেবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। এক্ষেত্রে কুরআন বলছে, 'তালাক (প্রত্যাহার যোগ্য) শুধু মাত্র দুবার দেয়া যেতে পারে। এতে স্বামীর প্রত্যাহার করার অধিকার আছে। অর্থাৎ প্রত্যাহার যোগ্য তালাক দু বার দিতে পারে অতপর হয়তো উত্তম ভাবে নিজের কাছে রাখবে নয়তো ন্যায় সংগত ভাবে তাকে ছেড়ে দেবে।' (সূরা বাকারা ২২৯) তৃতীয় বার তালাক দিলে প্রত্যাহারের আর সুযোগ থাকবে না। এতে স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে চিরকালের জন্য।

২. ইসলাম দ্বিতীয় পদক্ষেপ এই নিয়েছে যে, তালাক প্রত্যাহারের জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। যাতে করে পুরুষ মহিলাকে উৎপীড়নের জন্য উক্ত তিন তালাকের মধ্যে লম্বা বিরতি প্রয়োগ করতে না পারে। আর এই মেয়াদ হলো তিনটি ঋতুকাল। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'তালাক প্রাপ্তা মহিলা তিনটি ঋতুকাল পর্যন্ত নিজেকে আবদ্ধ বা বিরত রাখবে।' (আল বাকারা: ২২৮) এই জায়গায় পুরুষকে বলা হয়েছে, সে যদি তালাক দেয় তাহলে যেনো হিসাব রাখে। এটা খেল তামাশা নয় যে যখন খুশি তালাক দিয়ে দেবে। আর স্ত্রী জানবে না যে, স্বামী কখন তালাক দিল আর কখন ইদ্দত শেষ হল। ইরশাদ হচ্ছে, 'হে নবী, যখন আপনারা স্ত্রীদের তালাক দিবেন তখন তাদের ইদ্দতের সময় খেয়াল রাখবেন এবং ইদ্দত হিসাব রাখবেন। (সূরা তালাক ১নং আয়াত)

যে সব নারীর বয়সের স্বল্পতা, বার্ধক্য অথবা অন্য কোন কারণে হায়েজ বা ঋতু হয় না। তাদের ইদ্দত কাল তিন মাস। আর যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে তার ইদ্দত কাল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

ইরশাদ হচ্ছে, 'এবং যে সকল স্ত্রী ঋতুবতী হতে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সংশয় হয় (তাহলে তোমাদের জানা থাকা দরকার) তাদের ইদ্দত কাল তিন মাস। আর অনুরূপ বিধান তাদের বেলায় যাদের এখনো পর্যন্ত ঋতুকাল আরম্ভ হয়নি। আর যে সব নারী গর্ভবতী হবে সন্তান প্রসবই তাদের ইদ্দত কাল।' (সূরা তালাক আয়াত-৪)

ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দেয়া উচিত নয়

হাদীস শরীফে ঋতু কালীন সময় তালাক প্রদান নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট। ঋতুকালীন সময় নারীদের মধ্যে ঐ আকর্ষণ থাকে না যা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তাই এ অবস্থায় কোন কোন সময় স্ত্রীর প্রতি স্বামীর বিতৃষ্ণা এবং বিরক্তি আসতে পারে। তখন স্ত্রীর কোন আচরণ পুরুষের নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কারণে তালাক দিয়ে বসতে পারে। এসময় স্ত্রীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা যায় না। তাই স্ত্রীর দুর্বলতাকে সহ্য করার পরিবর্তে কোন কঠোর পদক্ষেপ নেয়াটা অসম্ভব কিছুই নয়। পক্ষান্তরে পবিত্র থাকাকালীন সময়ে জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সম্পর্ক উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে, তাই সে স্ত্রীর দোষত্রুটিগুলোও ক্ষমা করার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. ঋতুকালীন সময় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করলে রসূল আকরাম স. তাঁকে তা প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, যখন সে ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখন সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে। (যেন নিশ্চিত হয় যে, সে গর্ভবতী নয়)[৯]

তালাকের সুন্নত তরীকা

হাদীস শরীফে তালাকের সুন্নত তরীকা বর্ণিত হয়েছে। কোন পুরুষ অনিবার্য কারণে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করে এক তালাক প্রদান করবে। অতপর যখন পুনরায় ঋতু থেকে পবিত্র হবে তখনো সহবাস না করেই তাকে দ্বিতীয় তালাক দেবে। অনুরূপ তৃতীয় বারও ঋতু থেকে পবিত্র হলে তালাক দেবে। আর যদি স্ত্রী ঋতুবতী না হয় তাহলে একেক মাস বিরতি দিয়ে একটি করে তালাক প্রদান করবে। আর যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সহবাসের পরও তালাক দেয়া যেতে পারে।

ইদ্দত পালনকালে মহিলা স্বামীর গৃহে অবস্থান করবে

তালাকের পর ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর গৃহেই অবস্থান করবে। তবে যদি না তার দ্বারা অশ্লীল এবং নির্লজ্জ কাজ প্রকাশ পায় এবং তার সাথে থাকা মুশকিল হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে, 'ইদ্দত পালন কালে মহিলাদেরকে তাদের ঘর হতে বের করবে না এবং তারা নিজেরাও বের হবে না। তবে না যদি সে স্পষ্ট কোন বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়ে যায়।' (সূরা তালাক-১ আয়াত')।

এর মধ্যে কল্যাণের দিক হলো, একই গৃহে বসবাস করার কারণে পুরুষ নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এবং মহিলা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ পাবে। এভাবেই দুজনের সম্পর্ক বজায় রাখার কোন পথ বেরিয়ে আসতে পারে।

রুজু বা প্রত্যাহার করার অধিকার ও পন্থা

এক বা দুই তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রুজু করার অধিকার রয়েছে। যদি স্পষ্ট শব্দে তালাক প্রত্যাহার করে তবে প্রত্যাহার হওয়ার ব্যাপারে কোন ফকীহর ভিন্ন মত নেই।

হানাফীদের কাছে সহবাস এবং চুমু ইত্যাদি প্রত্যাহারের অর্থ প্রকাশ করে। কোন কোন ইমাম রুজু করার সময় সাক্ষীদের উপস্থিতি অপরিহার্য বলেছেন। কিন্তু হানাফীগণ এটাকে মুস্তাহাব এবং পছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।

কোন এক ব্যক্তি এক অথবা দুই তালাক দিয়েছে এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে রুজু করেনি এমতাবস্থায় স্ত্রী পৃথক হয়ে যাবে। স্বামী যদি পুনরায় তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করতে চায় স্ত্রীও যদি এতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলে নতুন মোহর দিয়ে পুন:বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। স্ত্রী প্রত্যাগন করলে তাকে জোর জবরদস্তী করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি তৃতীয় বার তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার একটাই সুরত আর সেটা হলো মহিলা যদি অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করে আর সেখান থেকে তালাক প্রাপ্তা হয় অথবা দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যু বরণ করে এরপর উভয়ে বিবাহ বন্ধনে রাজী হয়ে যায়। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক প্রদান করে তাহলে ঐ স্ত্রী তার জন্য ততক্ষণ হালাল হবে না যতক্ষণ সে অন্য স্বামী গ্রহণ না করে। দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক প্রদান করে এবং প্রথম স্বামী ও সে উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে তাহলে পরস্পরের প্রতি রুজু করলে কোন পাপ হবে না। তাই আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত বিধান। বোধ সম্পন্নদের জন্য তা বর্ণনা করা হয়েছে।' (সূরা বাকারা আয়াত-২৩০)

এভাবে তিন তালাকের পর রুজু বা প্রত্যাহার করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এ কাজে সানন্দে প্রস্তুত হয় না। মানুষ যাতে তিন তালাক দেয়ার পূর্বে ভাল ভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিতে পারে যে, রুজু বা প্রত্যাহার করা সহজ সাধ্য নয়, এর অবকাশ সৃষ্টি করাই উল্লেখিত পথ বলে দেয়ার মূল কারণ। এমতাবস্থায় স্ত্রী চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

তালাক প্রদানে অসাবধানতা এবং তা সংশোধনের পথ

এখানে একটি প্রশ্নের অবতারণা হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি তিন তুহুরে (পবিত্রতার সময়) তিন তালাক অথবা এক এক মাসের বিরতি দিয়ে তিন তালাক প্রদান না করে এক বারেই তিন তালাক দিয়ে বসে তাহলে তার

প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে? না কি উক্ত তিন তালাক 'বাইন' তালাক হিসেবে গণ্য হবে এবং তা প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে না?

সাধারণ ফিকাহবিদগণের মতে তা বাইন তালাক হিসেবে গণ্য হবে এবং রুজু বা প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে না। আহলে হাদীসের আলেমগণ এটাকে 'তালাকে রিজঈ' (প্রত্যাহার যোগ্য) বলে মতামত দেন। এটা একটি কানুনগত মত পার্থক্য। তবে এতে সবাই একমত যে, এটি সুন্নাতের পরিপন্থি কাজ।

হানাফী ফিকাহ মতে এটাকে 'তালাকে বিদআত' বলা হয়েছে। হানাফীদের মতে তালাকের উত্তম পদ্ধতি হলো, স্বামী তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলে প্রথমে এক তালাক দিয়ে ছেড়ে দেবে। এতে যদি ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে প্রয়োজনে নতুন ভাবে পুন: বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। তাঁরা বলেন, সাহাবায়ে কেরাম এক তালাকের বেশী কখনো দিতেন না।

এক সাথে তিন তালাক সাময়িক ক্রোধ অথবা কোন অসন্তুষ্টির কারণে ঘটে থাকে। এর পেছনে কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত থাকে না। এহেন ভুল এবং বিপদজনক পদক্ষেপের কারণে কঠিন ফলাফলের সম্মুখীন হতে হয়। এবং যখন সে নিজের ঘর বিরান হতে দেখে তখন আফসোস করতে থাকে। সুন্নাত তালাকের যে পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে এর উপর আমল করলে তাড়াহুড়ার কারণে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত।

তালাক কোন কোন সময় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলাম এর উত্তম তরীকা বা পদ্ধতি বলে দিয়েছে। ব্যাপকভাবে এর প্রচলন ঘটানো এবং এর প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এ ব্যাপারে সৃষ্ট সকল সমস্যা ও প্রশ্নের নিরসন হত।

অনুবাদ ঃ মাওলানা আবদুস সাত্তার

প্রমাণপঞ্জি

১. আবু দাউদ কিতাবুত তালাক, বাবু ফিত্ তালাকি আলাল হাযলি। তিরমিযী আব্ওয়াবুত্ তালাকি ওয়াল লিয়ানি, বাবু মা জাআ ফিল জাদ্দি ওয়াল হাযলি ফিত্ তালাক।

২. মুআ'লিমুস্ সুনান ৩/২৪৩

৩. আবু দাউদ, কিতাবুত্ তালাক, বাবু ফী কিরাহিয়্যাতিত্ তালাক। ইবনু মাজাহ, আব ওয়াবুত তালাক।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. দারে কুত্নী মা'আ তালিকুল মুগনী কিতাবুত্ তালাক, দিল্লী, পৃষ্ঠা-৪৩৯

৬. মিশকাত কিতাবুন নিকাহ, বাবুল খুলয়ি ওয়াত্ তালাক, সূত্র আহমদ তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা, দারেমী।

৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর খন্ড-১ পৃষ্ঠা-৫৬১-৫৬২

৮. বিস্তারিত দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসীর খন্ড-১ পৃষ্ঠা-২৭১-২৭২

৯. ঘটনাটি সিহাহ সিত্তাহর সকল কিতাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

আল কুরআনে দন্ডবিধি

মুঃ শওকত আলী

ধৈর্য ও আত্মরক্ষা

১. মন্দের প্রতিফল সে রকমেরই মন্দ। পরে যে কেউ ক্ষমা করে দেবে এবং সংশোধন করে নেবে তার পুরস্কার আল্লাহর জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেম লোকদেরকে পছন্দ করেন না।

২. আর যে সব লোক জুলুমের পর প্রতিশোধ নেবে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না।

অপরাধের দায় ঃ

১. তিরস্কার পাওয়ারযোগ্য সে সব লোক যারা অন্যদের উপর জুলুম করে এবং জমিনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এ লোকদের জন্য মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

২. অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে এটা নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।

সমাজে অপরাধীদের স্থান ঃ

১. যারা আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদকে ডাকে না, বৈধ কারণ ছাড়া আল্লাহর হারাম করা কোন প্রাণীকে ধ্বংস করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। এ সব কাজ যারা করে তারা নিজেদের গুনাহের প্রতিফল পাবে।

২. কেয়ামতের দিন তাদেরকে পুনঃপুনিক আযাব দেয়া হবে এবং তাতেই তারা লাঞ্ছনা সহকারে পড়ে থাকবে।

৩. এ থেকে বাঁচবে তারা যারা (এই সব গুনাহ্ করার পর) তওবা করে নিয়েছে এবং ঈমান এনে নেক আমল করতে শুরু করেছে। এই লোকদের দোষত্রুটি ও অন্যায়কে আল্লাহ্ তাআলা ভাল দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আর তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা ফোরকান আয়াত- ৬৮-৭০)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ।

অনুতপ্ত হওয়া ঃ

১. জেনে রাখ তাদেরই তওবা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কাজ করে থাকে এবং তারপর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ্ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান।

২। কিন্তু তাদের জন্য তওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপকর্ম করতেই থাকে। এ অবস্থায় যখন তাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্য কোন তওবা নেই, যারা মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরই থেকে যায়। এসব লোক জন্য আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি। (সূরা নিসা আয়াত ১৭-১৮)

দন্ড হবে অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যশীল ঃ

১. যে কেউ ভাল আমল নিয়ে আসবে তার জন্য তাহা অপেক্ষা উত্তম ফল রয়েছে, আর যে খারাপ আমল নিয়ে আসবে তার সম্পর্কে কথা এই যে খারাপ আমলকারীদের জন্য সে রকমই প্রতিফল দেয়া হবে যে রকমের আমল তারা করছিল। (সূরা কাসাস আয়াত ৮৪)

একজনের দায় অন্যে বহন করে না ঃ

প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে এর জন্য দায়ী সে নিজে। কোন ভার বহন কারীই অপর কারো বোঝা বহন করে না। (সূরা আনআম আয়াত ১৬৪)

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস
২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ
৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা
৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান
৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা
৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার
৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন
৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম
৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি। লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা) ১৪, শ্যামলী
শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রাহক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

সম্মানিত পাঠকদের মূল্যবান মতামত আমরা গুরুত্বসহকারে ছাপিয়ে থাকি।

ইসলামী আইন ও বিচার-এর এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

❖ ৫ কপির কম এজেন্ট করা হয় না।

❖ বছরের যে কোনো সময় এজেন্ট হওয়া যাবে।

❖ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম পাঠাতে হয় না। পোস্ট অফিস থেকে ভিপিপি প্যাকেট বুঝে নিয়ে টাকা পরিশোধ করতে হয়।

❖ এজেন্টগণকে প্রথমবারের মতো এজেন্সি ফি বাবদ ৫০.০০ (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে।

❖ ভিপিপিযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়। ভিপিপি গ্রহণ না করে ফেরত পাঠালে পত্রিকা আর পাঠানো হবে না।

কমিশনের হার

৫-২০ কপি = ৩০% ২০ কপির বেশি হলে ৪০% কমিশন প্রদান করা হবে।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

❖ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

❖ গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা সরাসরি জমা দিলে পত্রিকা পাঠানো হয়।

❖ রেজিস্ট্রি ডাক ছাড়া সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

গ্রাহক চাঁদার হার

দেশ	ষান্মাষিক (২ সংখ্যা)	বার্ষিক (৪ সংখ্যা)
বাংলাদেশ	৭০ টাকা	১৪০ টাকা
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল	২১০ টাকা	৪২০ টাকা
সউদী আরব, কুয়েত, ওমান, কাতার	২৮০ টাকা	৫৬০ টাকা
ইরান, ইরাকসহ এশীয় দেতশসমূহ	৩৫০ টাকা	৭০০ টাকা
ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশসমূহ	৮০০ টাকা	১৬০০ টাকা
উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওশেনীয় মহাদেশের দেশসমূহ	৯০০ টাকা	১৮০০ টাকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২
E-mail :ilrclab@yahoo.com

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা..

.... ফোন/মোবাইলঃ...

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে.......................................টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

স্বাক্ষর

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ৩০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৪০% কমিশন

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) =৩৫৪=১৪০/=
=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫৮=২৮০-১০=২৭০/=
=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(বার সংখ্যা =৩৫ ১২=৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসষ্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন- ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১-৩৪৫০৪২ ,
E-mail :ilrclab@yahoo.com

REGD. NO. DA 237(1) ISLAMI AIN O BICHAR : July-September -2005, TK : 35